**This book is part of the
Carey Library and Research Centre
at Serampore College.**

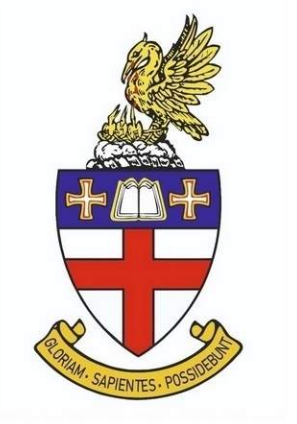

**This is a reproduction of a library book
that was digitized at the CLRC,
Serampore.
The information in this book is freely
available to the public and can be
quoted with proper reference.**

The use of this document may be subject
to the Copyright Law of India or to
site license or other rights management
terms and conditions. The person
using this document is liable for any
infringement.

আমাদের নেতৃবর্গ

লেখক

শ্রীঅনিলকুমার সরকার, বি-এ

CALCUTTA
PUBLISHED BY THE CALCUTTA CHRISTIAN
TRACT AND BOOK SOCIETY
1962

আমাদের নেতৃবর্গ

লেখক
শ্রীঅনিলকুমার সরকার, বি-এ

CALCUTTA :
PUBLISHED BY THE CALCUTTA CHRISTIAN
TRACT AND BOOK SOCIETY
1962

15095
Wz9.36
(christian biography)

ভূমিকা

বঙ্গীয় খ্রীষ্টিয় সমাজের পরলোকগত কয়েকজন নেতার জীবনী এই পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ করা হইল। কলিকাতা খ্রীষ্টিয় ট্রাক্ট এবং পুস্তক সমিতি এই উদ্দেশ্যে পুস্তকটী প্রকাশ করিল যেন সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মণ্ডলীর সভ্য ও সভ্যাগণ শ্রদ্ধাসহকারে জীবনীগুলি পাঠ করেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতারা যেমন সমাজদরদী হইয়া আপনাদের নানাবিধ কার্যের মধ্যেও মণ্ডলীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, এবং খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধিকল্পে নখ্রীষ্টিয়ান-দের মধ্যেও সুসমাচার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপন আপন জীবন মণ্ডলীর সেবায় ও খ্রীষ্টের সুসমাচার-প্রচারের নিমিত্ত উৎসর্গ করি।

সমিতির পক্ষ হইতে লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিলকুমার সরকার বি-এ মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সমিতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে বহুদিন যে অভাবটী ছিল, শ্রীসরকার মহাশয়ের সাহায্যে তাহার পূরণ হইল বলিয়া আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। যাঁহারা যে কোন প্রকারে পুস্তিকাটী রচনা করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রতি সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

আমরা আশা করি, বঙ্গীয় খ্রীষ্টিয় সমাজে এই পুস্তিকার বহুল প্রচার হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে আরও কয়েকজন প্রাতঃ-স্মরণীয় নেতার জীবনী প্রকাশ করা হইবে।

প্রবোধকুমার অধিকারী
সম্পাদক

সৌরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
আচার্য মথুরানাথ বসু	১২
বিপিনচন্দ্র সরকার	২৪
অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮
আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪
সুশীলকুমার রুদ্র	৬১
ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	৬৭
আচার্য বিমলানন্দ নাগ	৭৮
রেভাঃ লালবিহারী দে	৮৩
ডাঃ কালীচরণ ব্যানার্জী	৯০

SERAMPORE COLLEGE LIBRARY

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

SERAMPORE COLLEGE LIBRARY

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সমাজসেবক সতীশচন্দ্র আলোময় তব প্রাণ,
দীন সমাজের লাগিয়া করিলে নিজের জীবন দান ;
সমাজের মহা-মিলনের লাগি,
কতই ভ্রমিলে সবকিছু ত্যাগি,
জ্ঞানগরিমা সাহিত্যে তব আছে কত অবদান।
দীনের বন্ধু, করুণাসিন্ধু, খ্রীষ্টের প্রিয়-দাস,
ঐক্যবদ্ধ খ্রীষ্ট-সমাজ ছিল তব বিশ্বাস।
তোমার প্রেমের মন্ত্র লভিয়া,
শূন্য হৃদয় লইনু ভরিয়া,
তোমার সেবার নব প্রেরণায় রবো চির-গরীয়ান।

স্বনামধন্য স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন পরলোকগত উমেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। উমেশবাবু ছিলেন এল. এম. এস. মণ্ডলীর একজন কনভার্ট এবং তিনি ঐ মিশনের প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সতীশচন্দ্র এল. এম. এস.-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ঐ কলেজ থেকে অধ্যয়নের পরে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ভবানীপুরে এল. এম. এস. কলেজের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখেন। ইংরেজীর অধ্যাপক-হিসাবে কিছুদিন তিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি আইনের ডিগ্রি লাভ করবার পরে কলিকাতা বারে বা আইন-আদালতে যোগদান করেন। ১৯০৯ সালে তিনি শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক-গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। যখন Dr. Howells বিলাতে ছুটীতে যান তখন তিনি সহ-অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। চতুর্দশবৎসর কাল যোগ্যতার সহিত কার্য-পরিচালনার পরে তিনি আইনের ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং প্রায়ই পাবলিক প্রসিকিউটারের কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। মিঃ মুখার্জী ছিলেন প্রধানতঃ একজন জনসেবক এবং জনগণ তাঁর কার্যের ছিলেন অকুণ্ঠ সমর্থক। যৌবনাবস্থা থেকেই তাঁর একটী মহৎ গুণ প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটী ছিল তাঁর

রাজনীতি-জ্ঞানের উন্মেষ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে তাঁকে সরকারী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি যোগ্যতার সঙ্গে নয় বৎসর কাল খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সময়ে কাউন্সিলে তিনি একটী প্রয়োজনীয় বেসরকারী বিল আনয়ন করেন, সেটী অবশেষে আইনে পরিণত হয়। আইনটী ছিল সমগ্র দেশবাসীর উপকারার্থে নারীঘটিত পাপব্যবসায় বা 'Suppression of Immoral Traffic in Women'। কাউন্সিলের উচ্চতম কার্যভার গ্রহণেও তিনি তাঁর খ্রীষ্টীয় সমাজসেবার উদ্যোগ একটুও কমাননি।

অনেকদিন যাবৎ তিনি বেঙ্গল খ্রীষ্টান কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন এবং কমিটির সভ্য-হিসাবে যোগ্যতার সহিত কার্য-পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্য-বোর্ডের সভ্য ও আহ্বায়ক এবং প্রাণপণ পরিশ্রমে নানা পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার করেন। অবশেষে ঐ লিটারেচার বোর্ড খ্রীষ্টীয় ট্র্যাক্ট সোসাইটীর সহিত মিলিত হয়। অসীম যোগ্যতাসহকারে ও যুবজনোচিত উৎসাহে ক্রমবর্ধমান বয়সেও তিনি তার সম্পাদকপদ অলংকৃত করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত দক্ষতার সহিত সোসাইটীর কার্য-পরিচালনা ক'রে যান। এই ভক্তিনিষ্ঠা ও ত্যাগ খ্রীষ্টীয় সমাজকে চির-আলোকিত ও উদ্বুদ্ধ করে। বহুবৎসর পরেও সতীশচন্দ্রের কর্মপ্রেরণা আমাদের নূতন পথে উৎসাহিত করবে।

স্বর্গীয় মুখার্জী স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিসাধনার্থে যথেষ্ট উদ্যোগ প্রকাশ, ও নেতৃত্বভার ও গুরুভার অনায়াসেই বহন করেন। ১৯১৪ সালে সি. ডি. সি. প্রচারকার্যের দায়িত্ব এল. এম. এস. চার্চের উপরে ন্যস্ত করেন এবং স্বভাবতই তিনি তার প্রথম সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। ১৯২২ সালে যখন এল. এম. এস. কাউন্সিল গঠিত হয় এবং ১৯২৯ সালে কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চার্চ ইউনিয়নে উচ্চতম পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন ভবানীপুর কনগ্রিগেসানেল চার্চের সিনিয়র ডিকন্-হিসাবে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব করেন, এবং সুদীর্ঘকাল পৌরোহিত্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একটী কথা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করা যায় যে এত সভাসমিতি, মণ্ডলী ও সরকারী কার্যে সহযোগিতা তাঁর পক্ষে কি প্রকারে সম্ভবপর হত! অপরিমেয় কার্যকরী শক্তির অধিকারী সতীশচন্দ্রের এইসব কার্যের মূলে ছিল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি

অবিচল নিষ্ঠা—ইহাই তাঁকে নানা কার্যে অফুরন্ত শক্তি জোগাত। বিষ্ণুপুরের ইউনিয়ন খ্রীষ্টান স্কুলে গভর্নিং বোর্ডে তিনি এল. এম. এস.-এর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে তাঁর স্মরণীয় অবদান আছে। মুখার্জী ছিলেন একজন বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ। তাঁর কর্মপ্রবণতায় তিনি সর্বশক্তি ও একাগ্রতা প্রকাশ করতেন। এই অসাধারণ মনোভাব, দৃঢ়চিত্ততা ও অনেক সময়ে তাঁর স্বাধীনভাব লোকবিশেষের সঙ্গে বিরোধের মত সৃষ্টি করত। কিন্তু সতীশচন্দ্র ছিলেন অপরিমেয় শক্তির অধিকারী এবং তাঁর অনমনীয় মনোভাবকে অনেকে বহুবার ভুল বুঝেছিলেন। অনেক সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর সূক্ষ্ম গুণপণা সমালোচকেরা ভুলে যেতেন। দুঃস্থ, নিপীড়িত জনগণ বহুবার বহুসময়ে তাঁর কাছে পেয়েছিল মূল্যবান উপদেশ, জ্ঞানামৃত ও আইনের সুপরামর্শ। নিপীড়িত জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় তিনি বিচলিত বোধ করতেন ও তাঁর অসীম সহানুভূতিসহকারে সর্বশক্তি ও সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। যতক্ষণ না দুর্দশাগ্রস্ত সুবিচার পেত ততক্ষণ তিনি নিজ চেষ্টাকে শিথিল করতেন না। ঈশ্বরের উপরে ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ঈশ্বরের সব কাজেই ছিল তাঁর দরদ এবং সর্বোপরি চার্চের উন্নতি-বিধান ও মঙ্গলসাধনই ছিল জীবনাদর্শ।

১৯৩৯ সনের যুদ্ধের সময়ে সতীশচন্দ্র খ্রীষ্টীয় সমাজের যথার্থ মনোভাব ব্যক্ত করেন—উত্তমের দ্বারা মন্দ, প্রেমের দ্বারা শত্রুতাকে জয় করতে হবে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সতীশচন্দ্র যুদ্ধের সময়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে যুদ্ধের পরে ভারতের পটভূমিকা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হবে। ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীও সেইভাবে পুনর্গঠিত রূপ নেবে। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা সতীশচন্দ্র বহুবৎসর পূর্বেই বুঝেছিলেন যে, ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে জাতীয়-করণ করতেই হবে। বিদেশী মিশন বছরের পর বছর আসবে ও যাবে, কিন্তু ভারতের খ্রীষ্টমণ্ডলী কখনও লুপ্ত হবে না। জাতীয়-করণের জন্য সতীশচন্দ্র বহুবার বহুস্থানে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, খ্রীষ্টীয় সমাজকে নিজের বলে বলীয়ান হতে হবে; এছাড়া গত্যন্তর নাই। এমনই এক খ্রীষ্টমণ্ডলীর স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন যার মূল দৃঢ়ভাবে ভারতের মাটীতে থাকবে এবং যে মণ্ডলী হবে স্বাবলম্বী।

ভারতে নানা মণ্ডলীর আবির্ভাব ও মাণ্ডলিক ভেদাভেদ চিরকাল খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে করেছিল পঙ্গু। তাই সতীশচন্দ্র বলেছিলেন এই ভেদবৃক্ষকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করতে হবে; মাণ্ডলিক ভেদাভেদ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী এবং খ্রীষ্টের আত্মারও বিরোধী। এই ভেদাভেদ নখ্রীষ্টীয় জগতের নিকটে খ্রীষ্টসমাজকে শক্তিবিহীন করেছে, দূরীভূত করেছে খ্রীষ্টীয় মিলনের সুর।

পশ্চিম থেকে আগত বিবিধ মণ্ডলী আজও সমাজের ক্ষতিসাধন করছে। কবে পুরুষ-সিংহ সতীশচন্দ্রের পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী আমরা বাংলায় গঠিত করতে সক্ষম হব? সুখের কথা যে বহুবৎসর কঠোর পরিশ্রমের পরে ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। তবে এজন্য চাই চিরজাগ্রত মনোভাব ও যুবশক্তির প্রেরণা। যেদিন বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে চার্চ ইউনিয়ন, সেদিন মহাপ্রভু খ্রীষ্টের মনোবাসনা পূর্ণ হবে, সর্বোচ্চ শিখরে উড্ডীন হবে খ্রীষ্টের প্রেম-পতাকা। সতীশচন্দ্র ছিলেন প্রটেষ্টাণ্ট-ক্যাথলিক ঐক্যের উপাসক। আমাদের রাজনৈতিক অধিকারে যেন সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি প্রদর্শন করতে পারি। উপাসনা-পদ্ধতিতে বিভিন্নতা থাকলেও ক্যাথলিক ভ্রাতাদের সহিত ঐক্যগঠনের যথেষ্ট প্রয়াস আছে। হিন্দু-মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে তিনি বলেছিলেন। একদেশে বাস করে নখ্রীষ্টীয়ানদের সঙ্গে বৈরিভাব ভালো নয়। কর্পোরেশান, মিউনিসিপ্যালেটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে সতীশচন্দ্র খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতিনিধিত্বের দাবী করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় সমাজের আর্থিক অবস্থা সতীশচন্দ্রকে পীড়িত করেছিল। বেসরকারী চাকুরী, ব্যবসা, প্রতিযোগিতামূলক সরকারী চাকুরীতে তিনি খ্রীষ্টীয় যুবকদের যেতে বলতেন। আই. সি. এস., আই. পি. এস., আইন, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসায়ে তিনি খ্রীষ্টীয় যুবকদের যোগদান করতে বলেছিলেন। কোন কার্যকেই হীন মনে করা উচিত নয়। খ্রীষ্টীয় কন্‌ট্রাক্টার, দপ্তরী, মিস্ত্রি, দোকানদার, দর্জি ও মোটর-মেকানিকের কার্যে তিনি তাদের যোগ দিতে উপদেশ দেন। খ্রীষ্টীয় গ্রামে ও পল্লীতে তিনি চরকা ও তাঁতের প্রচলন চেয়েছিলেন। প্রতি যুবককে নিজ শ্রমে জীবিকা-নির্বাহ করতে হবে, তাতে হীনতার কিছু থাকবে না। আমাদের খ্রীষ্টীয় পরিবারগুলি হবে মণ্ডলীগঠনের স্তম্ভস্বরূপ। প্রতিটি গৃহ হবে কেন্দ্রভূমি। খ্রীষ্টীয় স্ত্রী তাঁর মতে হবে অসামান্যা, প্রতিভাশালিনী।

তাঁর প্রচেষ্টায় ও কর্মপ্রেরণায় চলবে সারা সংসার। স্বামীরও জীবন গঠিত ও পরিবর্তিত হবে তাঁর প্রচেষ্টায়। প্রকৃতপক্ষে মা-ই হবেন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মূল কর্মশক্তি। তাঁর মহান সংস্পর্শে এসে তারা হবে প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল ও সুন্দর। খ্রীষ্টীয় চার্চ এক কথায় হবে খ্রীষ্টীয় গৃহের প্রতিচ্ছবি। দোষ-দুষ্ট পরিবার চার্চকে ও সমাজকে করবে দুর্বল। আমাদের চেষ্টা হবে প্রতিটী গৃহকে সুন্দরতর ও পবিত্র এবং শান্ত, সংযত ও আনন্দময় করা। পরিবারে এমন গুণ থাকবে যাতে প্রতিবাসীরা পর্যন্ত আকৃষ্ট হবেন। আমাদের হাই স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের জীবন গঠিত হবে, সেখানে তারা যা দেখবে তাই শিখবে। প্রধানশিক্ষক মহাশয় হবেন আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন, একাধারে কঠোর নিষ্ঠাবান, সহানুভূতিসম্পন্ন ও দয়ার্দ্র। তিনি মনে রাখবেন তাঁর গুরুদায়িত্বের কথা; ছেলেমেয়েদের সব শিক্ষার তিনি হবেন আদর্শ। মাণ্ডলিক স্কুলের আলাদা আলাদা স্কুলের সতীশচন্দ্র পক্ষপাতী ছিলেন না। শৈশব থেকে খ্রীষ্টীয় ছেলেমেয়েদের যেন উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা হয়, এই ছিল তাঁর অভিলাষ। আবাসিক স্কুলগুলি (boarding-schools) হবে আদর্শ। অনেক সময়ে আবাসিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ঠিকভাবে নির্বাচিত হন না। অধ্যক্ষের প্রিয় অযোগ্য পাত্রদের অনেক সময়ে স্কুলে নিয়ে ছাত্রদের ক্ষতিসাধন করা হয়। সতীশচন্দ্রের মত ছিল যে, যেসব শিক্ষকের শিক্ষার প্রতি সত্যকার দরদ আছে তাঁদেরই স্কুলে নিযুক্ত করা উচিত হবে। স্কুলগুলিকে চালাতে হবে co-operative নিয়মে।

সতীশচন্দ্র পৃথক্ এঙ্গলিক্যান ও নন-এঙ্গলিক্যান আধ্যাত্মিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি চেয়েছিলেন একটী ঐক্যবদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসম্পর্কে তিনি বার বার সতর্ক করেছিলেন যেন তাঁরা Church Union পরিকল্পনার বিরোধী কিছু না করেন। সকল মণ্ডলীতে তিনি সকলের সঙ্গে সমান-ভাবে মিলেমিশে কার্য করতে বলেন।

পৌরোহিত্য-পদে যদৃচ্ছভাবে প্রার্থীদের যেন নির্বাচন না হয় এই ছিল তাঁর মত। প্রতিটি প্রার্থী সত্যই ঈশ্বরের আহ্বান পেয়েছেন কি-না জানা প্রয়োজন। খ্রীষ্টীয় সাহিত্য সম্প্রসারণ ও পরিপুষ্টি বিধানে তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির উপরে জোর দেন। পুরোহিত প্রতিপালন সম্পর্কে

সতীশচন্দ্রের সুচিন্তিত সুপরিকল্পনা ছিল। একটী কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পুরোহিতের মাহিনা দেওয়া হবে।

লেম্যান অথবা স্বাধীন খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অবৈতনিক পুরোহিতের কাজ করতে হবে। যেখানে উপযুক্ত শিক্ষিত পুরোহিত পাওয়া যায় না সেখানে শিক্ষিত অনুপ্রাণিত খ্রীষ্টভক্ত যুবকদের ঈশ্বরের সেবায় অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আজ এ কাজ কিন্তু অগ্রসর হয়েছে।

পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন উপাসনার বিষয়েও সতীশচন্দ্রের পরিষ্কার মতবাদ ছিল। পাশ্চাত্য প্রথা ক্রমশঃ ত্যাগ করে আমাদের ভারতীয়করণ করতে হবে। তিনি ভারতীয় সুরে বাঙ্গলা গানের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু ইংরাজী সুরে বাঙ্গলা গানের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রচারকার্য হবে আমাদের ধর্মের পবিত্র দায়িত্ব।

সতীশচন্দ্র খ্রীষ্টসমাজের ভবিষ্যতের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করতেন। কেন খ্রীষ্টমণ্ডলী জীবন্ত ও শক্তিশালী হতে পারে না সে সম্পর্কে তিনি বলে-ছিলেন যে :—

"চার্চের সাধারণ সভ্যগণ ক্রমশঃ জাগতিক ভাবাপন্ন হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, পুরোহিতবর্গ সব সময়ে ঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন নন। কেউ কেউ শিক্ষায়, দীক্ষায় ও আধ্যাত্মিকতায় গুণসম্পন্ন নয়। অনেকে গুরুদায়িত্ব বহনের উপযোগীও নন। বিদেশী মিশনারীদিগের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে তাঁরা ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের সঙ্গে মিশতে পারেননি। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলিও কমবেশী দেশের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। ভারতবাসীরা আমাদের ধর্মকে বিদেশী ধর্ম বলে মনে করেন।

মহাপ্রভু যে একজন শ্রেষ্ঠ যোগী ছিলেন সে কথা আমরা অনেকে বিস্মৃত হতে চলেছি এবং সেইজন্য আমরা সাধারণ ভারতবাসীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হই নাই। খ্রীষ্টের প্রকৃত ত্যাগের মর্ম আমাদের জীবনে প্রকাশিত হয় না। তাঁর জীবন যে ত্যাগ ও কঠোর সাধনার ছিল সে কথা প্রচারের বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই।"

সতীশচন্দ্রের মতে নখ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের অনেকে খ্রীষ্টকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন কিন্তু বাপ্তিস্ম বা ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন অনুভব করেন না ; তাঁরা মনে করেন যে সর্ব ধর্মই হ'ল সমান এবং ধর্ম পরিবর্তনের কোনো

প্রয়োজন নাই। বিগত মহাযুদ্ধগুলির জন্য এসিয়াবাসীর মনে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। সতীশচন্দ্র বার বার আমাদের খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের কথা বলেছিলেন। দিনের পর দিন বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে সতীশচন্দ্র জাতীয়ভাবের বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসারের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও সমাজের প্রতি দেশবাসীর কঠোর মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

খুব সংক্ষেপে আমাদের খ্রীষ্টীয় গৃহ, সমাজ, চার্চ, স্কুল, কলেজ ও হোষ্টেল নিশ্চিতভাবে হবে খ্রীষ্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত। আমাদের দেখাতে হবে যে আমাদের গুরু খ্রীষ্টের মধ্যে আছে এক অনিন্দ্য সুন্দরতা যা সকলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্।

সমাজের সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকার মারফতে খ্রীষ্টের বাণীকে নখ্রীষ্টীয় পাঠকের নিকটে উপস্থিত করবার জন্য সতীশচন্দ্র আজীবন সচেষ্ট ছিলেন।

সতীশচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন-সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন। সাইমন কমিশনে (Simon Commission) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খ্রীষ্টীয় কনফারেন্সের বঙ্গদেশের প্রতিনিধি-হিসাবে সতীশচন্দ্র খ্রীষ্টীয় সমাজের নির্বাচনের অধিকার-সম্পর্কে জোর দাবী করেন। পূর্বে Southborough Committee-তে আমাদের দাবী পেশ করে সমাজের প্রতিনিধি মনোনয়নে বঙ্গীয় কাউন্সিলে আসন মঞ্জুর করা হয়েছিল। অবশেষে লর্ড লোথিয়ানের অধীনে গঠিত Franchise Committee-তে সতীশচন্দ্র Joint Electorate with Reservation অথবা সংরক্ষিত যুক্ত নির্বাচনের দাবী করেন। কিন্তু খ্রীষ্টসমাজকে মাত্র দুইটী মনোনীত আসন দেওয়া হয়। সমাজের এই মনোনয়নের দাবী ছিল না এবং এ প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ হয়ে গিয়েছে। সমাজে রাজনৈতিক জাগরণ আনয়নের জন্য সতীশচন্দ্র বহুদিন যাবৎ পরিশ্রম ও প্রচার করেছিলেন। মণ্ডলীর ত্রুটীপূর্ণ শাসনব্যবস্থায় খ্রীষ্টসমাজ বহুবৎসর যাবৎ রাজনৈতিক চেতনাবিহীন ও অর্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় কালাতিপাত করছে। ১৯২১-১৯২৯ সন পর্যন্ত সতীশচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগ্যতার সহিত খ্রীষ্ট-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সভা-সমিতিতে সমাজে রাজনৈতিক চেতনা

ও অধিকার-সম্পর্কে জোরদার বক্তৃতা করেন। তিনি এ বিষয়ে অনেকটা সাফল্যলাভ করেছিলেন। অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে চেতনাবিহীন সমাজে স্পন্দন এসেছিল কিছুটা, এটা স্বীকার করতেই হবে।

Immoral Traffic Bill-এর অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন সতীশচন্দ্র এবং এজন্য তিনি যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করেছিলেন। সরকারী কার্যের অযোগ্যতার কঠোর সমালোচনা করতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মনোনীত প্রার্থী হলেও তিনি নিজস্ব মত ত্যাগ করেন নি। সতীশচন্দ্রের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেন তিনি স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল ও জীবন্ত প্রচারধর্মী সমাজ জীবদ্দশায় দেখে যান। এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?

বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় কাউন্সিলব্যতীত সতীশচন্দ্র National Christian Council-এর সম্পাদক ও সহ-সভাপতিরূপে যোগ্যতার সঙ্গে কার্য করেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি German Lutheran Mission-এর রাঁচীর কার্য পরিচালনা করেছিলেন।

I.C.A.B. বা ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘের তিনি ছিলেন একজন যোগ্যতম বিশিষ্ট কর্মী ও প্রকৃতপক্ষে তার প্রাণশক্তি। প্রতিষ্ঠানের প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত Bengal Christian Conference, Indian Christian Workers' Union, কলিকাতা ভিজিল্যান্স এসোসিয়েশন, কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়, কলিকাতা মিশনারী কনফারেন্স-এর প্রথম ভারতীয় সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৪ সনে All-India Christian Conference-এর স্থাপনকালে তিনি বিরোধীদিগের বাধা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানস্থাপনে সহায়তা করেন। কয়েকবছর তিনি তার সম্পাদকত্ব ও পরে ১৯২১ সনে তিনি কনফারেন্সের লাহোর-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘ তখন recognized বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ছিল।

ক্যাথলিক-প্রোটেষ্টাণ্ট-এর একজন উদ্যোগী সমর্থক ছিলেন সতীশচন্দ্র। ক্যাথলিক নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি আজীবন ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ বজায় রাখেন।

শিক্ষাবিষয়ে সতীশচন্দ্র আজীবন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতার L.M.S. College-এ বহুবছর তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন। পরে শ্রীরামপুর কলেজের সেক্রেটারীর, সহ-অধ্যক্ষের ও অধ্যক্ষের পদেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজের সেবায় তিনি নিজের বহু ক্ষতি স্বীকার করেও যোগদান করেন। সমাজের যথাযথ অভাব-অভিযোগ তিনি অবগত ছিলেন বলে এবং নিজে শিক্ষাকার্যে লব্ধ বিদ্যায় সমাজসেবার বিষয়টি সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন।

তিনি ১৯২৯ সন থেকে ৬ বৎসরকাল Bengal Christian Literature Board-এর সম্পাদক ছিলেন। আমাদের জানা আছে উৎকৃষ্টতর বঙ্গসাহিত্য প্রচারের জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না এবং সুসাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি সর্বদা খ্রীষ্টীয় লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দিতেন যেমন হাওড়ার পরলোকগত সাহিত্যিক রমানাথ পালিত। রমানাথ পালিত বাঙ্গলা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন যেগুলি Calcutta Christian Tract Society প্রকাশিত করেছিলেন। সতীশচন্দ্র ২০ বৎসর যাবৎ বাইবেল অনুবাদ কমিটিতে যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব' ও 'ভারত-সেবক' পত্রিকাদ্বয়ের তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। 'ভারত-সেবক' ছিল All-India Christian Conference-এর মুখপত্র। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় Family Pension Fund-এর ডাইরেক্টররূপে ও সভাপতিরূপে সতীশচন্দ্র এই সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। এই Pension Fund-এর দ্বারা বহু খ্রীষ্টীয় পরিবার আর্থিক উপকার লাভ করেছেন। আজ সময় এসেছে এই Family Pension Fund-কে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করবার। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ কি এই বহু পুরাতন প্রতিষ্ঠানটিকে আবার জনপ্রিয় করে তুলবেন না?

চাকুরীবিষয়ে সতীশচন্দ্র খ্রীষ্টসমাজের জন্য উচিত দাবী করেছিলেন এবং পূর্বতন নেতাদের চেষ্টায় সমাজ কিছুটা উপকৃত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী চাকুরীতে সামান্যতম অধিকারলাভে অনেক যুবক উপকৃত হয়েছিলেন কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতম খ্রীষ্টীয়ানেরাও প্রায়ই সুবিচার পাচ্ছেন না। দেশের স্বাধীনতা-

SERAMPORE COLLEGE LIBRARY

লাভের পর নখ্রীষ্টীয় সমাজ উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে খ্রীষ্টীয় সমাজের যুবক-যুবতী-দিগকে সমান অধিকার কেন দিতে পারছেন না, এটী দুর্জ্ঞেয় মনোভাব।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় খ্রীষ্টীয়ানের কোনো আসন নাই এবং তার প্রতিনিধিত্বও কেহ করেন না। সংখ্যানুপাতে চাকুরী-ব্যবস্থা আমাদের মঙ্গলই সাধন করেছে এবং Joint Electorate with Reservation ব্যবস্থাপক সভায় অন্ততঃ খ্রীষ্টসমাজের প্রতি সমুচিত ব্যবস্থা হ'ত। ভারত-সরকার লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করবেন এই ছিল প্রতিশ্রুতি, কিন্তু এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের উচিত লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করা ও উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের উপরে অবিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিশনের বিদেশী সাহায্য সতীশচন্দ্রকে পীড়িত করেছিল এবং তাঁর ভারতভ্রমণেও তিনি ব্যথিত সুরে বলেছেন ঐ সাহায্যের জন্য দেশীয় মিশনারীরাও বিদেশীদের নিয়মকানুন পছন্দ করেন। স্বাধীন খ্রীষ্টীয়ানেরাও মনে করেন যে পুরোহিত মহাশয়ের হাতে সব ঠিক আছে, ফলে সমাজ-জীবনে গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়েছে; কারণ সভ্যদের মণ্ডলীর প্রতি কোনো সত্যকার দরদ সৃষ্টি হয় নাই। এই বিদেশী সাহায্যের জন্য এখনও বিভিন্ন মণ্ডলীর অস্তিত্ব বর্তমান, আমাদের কাজে কোনো প্রগতি নাই, সমাজে কোনো স্বাধীন চিন্তা নাই। Church Union পরিকল্পনাকে উজ্জ্বলতর মনে হলেও বিদেশী শাসন ও অর্থসাহায্যের জন্য শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী-পরিকল্পনা বান-চাল না হয়। চার্চের সম্পত্তিগুলি-সম্পর্কে সতীশচন্দ্র চেয়েছিলেন যেন উপাসনালয় চার্চের সম্পত্তি হয়, কিন্তু অধিকাংশ ছিল মিশনের সম্পত্তি। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বরাবর বলেছিলেন, যেন চার্চের সম্পত্তি চার্চের নামে হস্তান্তরিত করা হয়, মিশনের সম্পত্তি হয়ে যেন না থাকে। এই দাবীর মূলে যথেষ্ট যুক্তি ছিল; কেননা বিগত ১০।১৫ বছর যাবৎ বহু স্থানে চার্চ বিক্রয়ের চেষ্টা মিশন করেছেন এবং ফলে অনেক স্থলে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। চার্চ সব সময় থাকবে জনসাধারণ ও উপাসক-দের স্বার্থে ও নামে। সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্য বন্ধ করবার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা' কতটা কার্যকরী হয়?

Dr. Howells-এর আমন্ত্রণে তিনি শ্রীরামপুর কলেজের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক মান উন্নীত করবার জন্য

তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় ছিলেন। ১৯১০ সনে তিনি সেখানে ইংরাজীর অধ্যাপনা সুরু করেন এবং তাঁর ওকালতী ব্যবসা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন। Theological বিভাগে তিনি Church History অধ্যাপনা করতেন। College Faculty-তে সতীশচন্দ্র ছিলেন একমাত্র বাঙ্গালী অধ্যাপক এবং তাঁর মতামতের যথেষ্ট মূল্য ছিল। Arts Department-এর তিনি বহু বৎসর সম্পাদক ছিলেন।

২৮শে মে, ১৯৪৪ সনে সতীশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। বাস্তবিক তাঁর মত পরিশ্রমী নেতা শুধু বাঙ্গলায় কেন, ভারতে বিরল। Bengal Legislative Council, Assembly, কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, Bengal Christian Family Pension Fund, আলিপুর বার-এসোসিয়েশন, শ্রীরামপুর কলেজ, লর্ড বিশপ ডাঃ ফস্ ওয়েস্টকট্, অর্থমন্ত্রী নলিনী সরকার, ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী, 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সম্পাদক মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিঃ ফজলুল হক, বর্ধমানের মহারাজা, All-India Christian Conference আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বাস্তবিক পক্ষে সতীশচন্দ্র বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের অন্যতম অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, পরিশ্রমী, সমাজহিতৈষী, বাগ্মী ও সমাজে সঠিক কি প্রয়োজন তা বুঝতেন। সমাজের সত্যকার দরদী-হিসাবে তিনি অমূল্য সময় ব্যয় করে অনেক স্থানে ভ্রমণ করতেন ও সমাজের দাবী, অভাব-অভিযোগ অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করতেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন। খ্রীষ্টসমাজে যেন তাঁর মত অক্লান্ত কর্মী আরো জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বহুবিধ অবদান খ্রীষ্টসমাজ তথা দেশ কখনও বিস্মৃত হবে না। মৃতপ্রায় খ্রীষ্টসমাজে সতীশচন্দ্রের মত পরহিতব্রতী ও নিষ্ঠাবান নেতার আবার কবে আবির্ভাব হবে?

আচার্য মথুরানাথ বসু

বঙ্গদেশেতে ছড়াইলে তুমি খ্রীষ্টের মধু-নাম,
তোমার ভক্তি, প্রচার, সাধনা, পুণ্য মথুরানাথ,
খ্রীষ্টের প্রেমে অবিচল তুমি বিশ্বাসী গুণধাম,
তোমার ত্যাগের দীপ্তি মহান, রহ খ্রীষ্টের-সাথ।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ, মধুমতী নদীর বাম ধারে অবস্থিত। স্থানটিতে নমঃশূদ্রের বসবাস বেশী।

রেভাঃ মথুরানাথ বসু যশোহরের অন্তর্গত চাঁদপুরে ১৮৪৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোহরে লেখাপড়া করেছিলেন। লেখাপড়ায় তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। আর্থিক সঙ্কটের জন্য পড়াশোনা চালানো কঠিন হয়েছিল। এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি স্কলারশিপ নিয়ে উত্তীর্ণ হ'ন। কলিকাতায় এসে তিনি Duff College-এ ভর্ত্তি হ'ন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন-পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হ'ন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Rev. Fyfe কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হ'ন। মথুরানাথ আইন-ব্যবসা সুরু করেন কিন্তু তাহা ত্যাগ করেন। তিনি L.M.S. স্কুলের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টধর্মের মহানাম প্রচার করতে থাকেন। ঠিক সেই সময় ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট নমঃশূদ্রদের ও মুশ্লীমদের মধ্যে কাজ করবার জন্য একজন খ্রীষ্টীয় মিশনারী অনুসন্ধান করছিলেন। নমঃশূদ্রেরা সর্ববিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। মথুরানাথ সে সংবাদ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শের পরে—গোপালগঞ্জে যেতে মনস্থ করলেন। একজন বন্ধু তাঁকে সেই কাজের জন্য ৫০৲ মাসে দিতে চাইলেন। রেল, ষ্টীমার না থাকায় মথুরানাথ নৌকায় করে গোপাল-গঞ্জ রওনা হলেন। কলিকাতা থেকে পৌঁছাতে সেকালে অন্ততঃ ১৪ দিন সময় লাগত। তখনকার দিনে নৌকাপথে অনেক ডাকাতি হ'ত এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে লোকজন অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে

আচার্য মথুরানাথ বসু

আছে। পুলিশ ষ্টেশনের নিকটে মথুরানাথ বাড়ী ভাড়া করলেন। গোপাল-গঞ্জের আশপাশে তিনি প্রভুর অমৃতবাণী প্রচার করতে লাগলেন ও বেশ জন-সমাগম হতে লাগল। মহাভারত-নামক একজন লোক বাপ্তাইজিত হয়েছিল। মধুসূদন নামে তার একজন আত্মীয় ছিল এক দলের সর্দার। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আত্মীয়ের ধর্মান্তরকরণে আচার্য মথুরানাথকে সে হত্যা করবে। হাতে একটী রামদা নিয়ে সে মথুরানাথের বাড়ীর নিকটে অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রে তিনি বাহিরে বার হলে তাঁকে হত্যা করা হবে তাই ঠিক হ'ল। কিন্তু মথুরানাথের আজীবন অভ্যাস ছিল রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলেই তিনি প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকতেন। তিনি মধুসূদনের জন্যই বিশেষ-ভাবে প্রার্থনা করছিলেন যেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করে তার মন-পরিবর্তন করেন ও তার সর্ববিধ মঙ্গল হয়। কিন্তু মথুরানাথ জানতেন না যে মধুসূদন নিকটেই তাঁকে বধ করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট-ভক্ত মথুরানাথের প্রার্থনার কথা শুনে মধুসূদনের মন পরিবর্তিত হ'ল এবং সে ভাবল যাকে সে নিঃশেষ করতে চাইছে তিনি তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনায় নিবিষ্ট আছেন। সে তৎক্ষণাৎ মহাভারতের কাছে গেল এবং তাকে জানিয়ে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। গুপ্ত রামদা হাতে দেখে মহাভারত আতঙ্কিত হ'ল কিন্তু তখন মধুসূদন অনুতপ্ত হওয়াতে তারা দুজনায় আচার্য বসুর নিকটে ক্ষমাভিক্ষা করতে গেল। প্রার্থনাশীল মথুরানাথ তাদের নিকটে প্রভুর বাক্য প্রচার করলেন, গান করলেন এবং নিঃসংকোচে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

প্রতিদিন প্রচারের ফলে খ্রীষ্টীয়ান ও নখ্রীষ্টীয়ান শ্রোতাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি নখ্রীষ্টীয়ানদিগের জন্য একটী স্কুল খুলবার ইচ্ছা করলেন। অশিক্ষিত জনগণ তাদের ছেলেদের মথুরানাথের স্কুলে পাঠাতে চাইত না, যদিও এই মহাপ্রাণ খ্রীষ্টীয়ান সকলের দরজায় গিয়ে ছেলেদের পাঠাতে বলতেন। ছেলেরা বরং মাঠে গরু চরাবে কিন্তু তারা ছেলেদের খ্রীষ্টীয় স্কুলে পাঠাতে চাইত না। কিছুসংখ্যক ছেলে নিয়ে তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যাও বাড়তে লাগল। বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় পরিবার থেকে তিনি উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করতে লাগলেন। অবশেষে স্কুলটি M.E. মানে উন্নীত হ'ল।

এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একজন শিক্ষা-সমাপনান্তে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিছুদিন পরে ছাত্রটির আত্মীয়স্বজন এসে তাকে বাড়ী নিয়ে গেল এবং অবশেষে পুলিশ সাহেবের নিকটে নালিশ করল যে মথুরানাথ অন্যায়ভাবে শ্রীনাথ অধিকারীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। পুলিশ অফিসার আশপাশের গ্রামবাসীর সঙ্গে পরামর্শের পরে ঠিক করলেন যে মথুরানাথকে গ্রেপ্তার করা হবে। গ্রামের এক আসন্ন মেলা ও ভোজের পরে লোকজন নিয়ে ঠিক হ'ল যে নির্ধারিত দিনে কাজটি করা হবে। মথুরানাথ সব কথা শুনেছিলেন এবং আকুল প্রার্থনা-ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এই বিপদের সময়ে তাঁর দুইজন অনুগত ভৃত্য এসে মনিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। তিনি তাদের মাদারীপুরে একবার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে একটী চিঠি নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। তারা রাজী হওয়ায় মথুরানাথ তাড়াতাড়ি এক চিঠি পাঠালেন সেখানকার মিশনারী আচার্য Milen-এর নিকটে। পরের দিন অতি প্রত্যুষে তারা মাদারীপুরে পেঁৗছে ব্যাপটিষ্ট মিশনের আচার্য মিলানকে মথুরানাথের পত্রটি দেয় ও তিনিও সঙ্গে সঙ্গে Jt. Magistrate-এর নিকট থেকে এক পত্র আনলেন যে গোপালগঞ্জের পুলিশ অফিসার যেন আচার্য মথুরানাথকে গ্রেপ্তার না করেন কিন্তু তিনি নিজে তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন। দুইজন পত্রবাহক উমাচরণ বিশ্বাস ও হরিচরণ মণ্ডল মাদারীপুর থেকে বেলা ১২টার মধ্যে ফিরে এল—তখন লোকেরা সেই বিরাট ভোজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আচার্য বসু পত্রখানি অবিলম্বে গোপালগঞ্জের পুলিশ সাহেবের নিকটে প্রেরণ করলেন এবং সমবেত লোকেরা ভোজে যোগদান না করে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। কিছুদিন পরে মাদারীপুরের যুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং গোপালগঞ্জে এসে মথুরানাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। দিন-ক্ষণ স্থির করবার পরে Jt. Magistrate মথুরানাথকে মাদারীপুর কোর্টে যেতে বললেন এবং গোপালগঞ্জের O.C.-কে আদেশ দিলেন যে তিনি ঐ দিন ও সময়ে মথুরানাথকে মাদারীপুর কোর্টে হাজির করেন। নির্ধারিত দিনে মথুরানাথ তাঁর সবুজ রঙ্গের নৌকায় চড়ে মাদারীপুরে উপস্থিত হলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে কোনো গন্তব্য স্থানে গেলে মথুরানাথ গান ও প্রার্থনা করতেন। বেলা দশ ঘটিকায় তিনি আদালতে হাজির হলেন।

শ্রীনাথ অধিকারীও সেখানে হাজির হয়েছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি নিজে দরখাস্ত করেছিলেন কি-না এবং তাতে সহি দিয়েছিলেন কি-না। তিনি তখন উত্তর দিলেন যে আবেদনপত্র অন্য লোকে লিখেছিল এবং সেটী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। তাঁকে জোর করে কাগজে সহি করতে হয়েছিল। তিনি আরো বললেন যে আবেদনপত্রে সহি করবার পর তাঁর হাত অবশ হয়ে গিয়েছে কারণ অনর্থক মোকদ্দমা একজন ধর্মপ্রাণ লোকের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন মোকদ্দমা বাতিল করে দেন। শ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তিনি কার সঙ্গে যাবেন। শ্রীনাথ দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন যে তিনি আচার্য বসুর সঙ্গেই যাবেন। সুতরাং তাঁকে ইচ্ছামত তাই করতে দেওয়া হ'ল। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি গোপালগঞ্জে ছিলেন, তারপরে বহরমপুরে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মণ্ডলীর সেবা করেন। তাঁর ছেলেরা বিভিন্ন স্থানে মিশন-কাজে নিযুক্ত আছেন। মথুরানাথ পরলোকগত এস. সি. মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে গোপালগঞ্জে মিশনের কাজ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ করেছিলেন। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ W. S. Wells, I.C.S.-এর আমন্ত্রণে তিনি ঐ স্থানে নমঃশূদ্রদের সেবায় বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। একটী কুঁড়ে ঘরে মথুরানাথ বাস করতেন। জনগণের মধ্যে তিনি খ্রীষ্টের মহিমাময় সুসমাচার প্রচার করতেন।

গোপালগঞ্জ—নদীর তীরব্যতীত গোপালগঞ্জ বড় বড় জলাভূমিতে পূর্ণ। নমঃশূদ্র-নামক জাতি প্রথমে বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই ছিল। ঢাকার কোনো ক্রোধী ব্রাহ্মণ ক্রোধবশতঃ তাদের অভিশাপ দেন এবং শেষে তারা দলে দলে ভিটামাটি ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে ফরিদপুর, যশোহর ও বাখরগঞ্জে চলে আসে। তারা অনেক পরিশ্রম করে নীচু জলাভূমিগুলি পূরণ করে, নীচু জায়গাগুলি বেশ উঁচু ক'রে সেখানে ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করে। বর্ষা থেকে রক্ষা পাবার জন্য জায়গাগুলি ১২ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু করা হয়। ধান, পাট প্রভৃতির চাষ তারা করে থাকে এবং মাছধরা, পাখীধরা, মাদুরের ঝুড়ি, তাঁতের কাজ ও ঘাসকাটা তাদের প্রধান কাজ। এই নমঃশূদ্রদের গ্রীষ্মের সময়ে খুব জলকষ্ট এবং বর্ষার সময় প্লাবনে সব ভেসে যায়। এমনি বিচিত্র দেশ ফরিদপুর!

নমঃশূদ্র খ্রীষ্টীয় কনভার্টকে সেখানে অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বাঙ্গলাদেশে নীচবংশীয় হিন্দু কনভার্টকে যেমন নির্যাতন সহ্য করতে হয় গোপালগঞ্জে নমঃশূদ্র কনভার্টকেও সেইরূপ যাতনাভোগ করতে হ'ত। গোপালগঞ্জে এমন বহুসংখ্যক হিন্দু কনভার্ট আছেন যাঁরা ধর্মান্তর-গ্রহণের ফলে মাতা-পিতা, আত্মীয়, বন্ধু, স্বজাতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন ও তাঁদের ভিটেমাটি ত্যাগ করতে হয়েছে। নির্যাতিতের বন্ধু প্রভু যীশুকে জীবনে গ্রহণ করে খ্রীষ্টীয়ানের উপরে এই নির্যাতন স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে।

আচার্য মথুরানাথ বসু সুদীর্ঘ ২৭ বৎসরকাল খ্রীষ্টের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মিশনের কাজকর্ম সব শ্রীমতী বসু ও ছেলেরা দেখাশোনা করেন। ঐ মণ্ডলীর আরো দুইজন অক্লান্ত কর্মী আচার্য মধুসূদন সরকার ও আচার্য তারকনাথ বসু বহুদিন খ্রীষ্টের কার্য করে পরলোকগমন করেছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অবৈতনিক মণ্ডলীর কর্মীর মধ্যে ছিলেন—শ্রীমতী এম. এন. বসু, শ্রীএস. এম. বসু, শ্রীএন. জে. বসু, রেভাঃ শশীভূষণ বসু, ইত্যাদি। তাঁরা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতার স্থাপিত ধারায় মণ্ডলী চালনা করেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন মথুরানাথ স্কটল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন তখন Mr. Somerville একটী স্কটিশ কমিটি গঠন করেছিলেন।

গোপালগঞ্জে হরিচরণ মণ্ডল-নামক একজন লোক যখন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হয় তখন আচার্য মথুরানাথকে বেশ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশের প্ররোচনায় খ্রীষ্টমণ্ডলী ও রেভাঃ মথুরানাথের বিরুদ্ধে অপহরণের দোষারোপ করা হয়। পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর মিশনারীদিগকে গ্রেপ্তার করেন ও পরে জামিনে খালাস দেন। যুবকটির বয়স হয়েছিল সেইজন্য প্রথমে মিশনারীরা বিশেষ চিন্তিত হ'ন নাই। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিশের ইচ্ছা ছিল মিশনারীদিগকে হাতে হাতকড়া দিয়ে শহর, বাজারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে পরে তাঁদের মাদারীপুরে কোর্টে হাজির করা। এইভাবে পুলিশও উগ্র সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন ছিল। বর্ষার সময় তখন এমন অবসরও ছিল না যে গোপালগঞ্জ থেকে তাড়াতাড়ি মাদারীপুরে লোক পাঠিয়ে কোনো ব্যবস্থা করা যায়, কারণ

নৌকায় যেতেই দুই দিন লাগত। টেলিগ্রামেরও কোনো উন্নততর ব্যবস্থা তখন ছিল না যে মাদারীপুরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যায়। গোপালগঞ্জের মিশনারীরা তখন ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজকে দেখাশোনা করতেন এবং তাঁরা জামিনে খালাস ছিলেন; অনেকে ভয় পেলেন যে খ্রীষ্টসমাজের উপরে যদি কোনো হামলা হয়। সকলে প্রার্থনায় দিনরাত্রি যাপন করতে লাগলেন। হঠাৎ দুপুররাত্রে হরিচরণ মণ্ডল ও অন্য একজন যুবক মিশনারীদিগের নিকট এসে বললেন যে তাঁরা পদব্রজে মাদারীপুরে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে দুই দিনের পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করবেন। যাত্রা-পথ ছিল অতি দুর্গম—সুদীর্ঘ ৬০ মাইল; পথ জলে পরিপূর্ণ এবং জলাভূমিতে সাপেরও ভয় ছিল। খ্রীষ্টভক্ত নিষ্ঠাবান হরিচরণ ও উমাচরণ হ্যারিক্যান নিয়ে অন্ধকার, বৃষ্টিময় দুর্যোগের রাত্রে তাঁদের যাত্রা সুরু করলেন। যখন পরে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁরা একেবারে পরিশ্রান্ত। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁর আসা পর্যন্ত তিনি কিছু না করেন। পুলিশ-ফাঁড়িতে তখন মহাভোজের আয়োজন হয়েছিল সেখানে বেশ ধুমধাম ছিল যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিঠি সাব ইনস্পেক্টরকে দেওয়া হ'ল। চিঠি পড়ে পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর রীতিমত আশ্চর্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। পরে মামলার বিচারে প্রমাণ হ'ল যে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিদ্বেষপ্রসূত। পুলিশের দোষ প্রমাণিত হ'ল এবং কোর্ট পুলিশ ও আবেদনকারী উভয়ের বিরুদ্ধে মিশনারী-দিগকে মোকদ্দমা রুজু করবার আদেশ দিলেন। এইভাবে সেই সময়ে পুলিশ পূর্ববঙ্গে দরিদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজ ও মিশনারীদিগের উপরে অনর্থক হামলা ও হয়রাণি করত। ইংরাজ-রাজত্বে খ্রীষ্টীয়ানের উপরে কেহ কোনো পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেন নাই। আবেদনকারীদের পুলিশ দিত উস্কানি, সেইজন্য মিশনারীগণ দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। সেটা তাঁদের সহনশীলতা ও খ্রীষ্টীয় আদর্শের পরিচয়। মিশনারীরা কোনো দিন অজ্ঞ, মূর্খ জনগণের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তার প্রধান কারণ খ্রীষ্টধর্ম প্রতিশোধ নিতে তাঁদের শিক্ষা দেয়নি। স্যার চার্ল্‌স ঈলিয়ট পরে অনুসন্ধান করে দোষী পুলিশদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু এই ঘটনায় খ্রীষ্টের আদর্শবাদী,

নীরব-কর্মী হরিচরণ ও তাঁর সহকর্মীর অসীম ত্যাগের জন্যই সাফল্য সম্ভবপর হয়েছিল।

হরিচরণের জীবন-প্রদীপ যখন নিভে আসছিল তখন তাঁকে গোপালগঞ্জে আনা হয়; স্ত্রী হিরণবালা সরকার অক্লান্তভাবে তাঁর স্নেহ-পরিচর্যা করেন। হরিচরণবাবু সকল দর্শনার্থীদের প্রার্থনা ও গান করতে বলতেন। সর্বোপরি তিনি সকলকে খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করতে উপদেশ দিতেন। উমাচরণ মণ্ডল-নামক খ্রীষ্টীয় কনভার্ট বহুদিন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তিনি অল্প শিক্ষিত হলেও প্রতি রবিবার উপাসনালয়ে গির্জা করতেন ও উপদেশ দিতেন। যখন জলধর ও উমেশ সরকার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তখন জনসাধারণ খুবই উত্তেজিত হয়েছিল। খ্রীষ্টানপাড়ার লোকদের আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। আচার্য মথুরানাথ সেই বিপদের সময়ে সহকর্মীদের নিয়ে প্রার্থনায় নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁদের মনে আতঙ্ক বা ভয় ছিল না। হঠাৎ একটী প্রবল ঝড়ে ও বৃষ্টিতে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল; শত্রুরা তখন বেগতিক দেখে ছিন্নভিন্ন হ'ল। রেভাঃ মথুরানাথ স্ত্রীকে নিয়ে গোপালগঞ্জে বসবাস করছিলেন কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁকে সমাধিস্থ করবার কেহই ছিল না। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুশ্লীমদের সহায়তায় মথুরানাথের স্ত্রীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। প্রতিবাসীরা অনেকে মথুরানাথকে ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু বলে মনে করতেন; কারণ বাস্তবিকই তাঁর জীবন ছিল প্রার্থনা, ধ্যান ও সাধনার আধ্যাত্মিক জীবন। ঈশ্বরের উপরে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস যা তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এক সময় যখন মথুরানাথ মধুমতী নদীর ধারে তাঁর ঘর তৈয়ারী করেছিলেন তখন শুনলেন যে নদী ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তাঁর বাড়ীর দিকে আসছে ও বাড়ীটির রক্ষা নাই। এই শুনে প্রার্থনাশীল মথুরানাথ সহকর্মীদের নিয়ে নদীর ধারে প্রার্থনা ও ধ্যানে বসলেন; কিছুদিন পরে দেখা গেল যে নদী দুই মাইল পর্যন্ত একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তাঁর বাড়ী রক্ষা পেল। গোপালগঞ্জের অন্তর্গত বেদগ্রামের লোকেরা একবার মথুরানাথকে এসে বললে জলের অভাবে একেবারে ধান হয়নি, আর ধান না হলে তারা খেতে পাবে না। মথুরানাথ একবার মাঠে গিয়ে ঈশ্বরের নিকটে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন; পরে সেখানে বৃষ্টি হয় এবং দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানেরা অনেক ধান

SERAMPORE COLLEGE LIBRARY

পেয়ে যায়। মথুরানাথের প্রার্থনার শক্তিতে সকলেই বিশ্বাস করতেন এবং জানতেন তা কার্যকরী হবেই।

গোপালগঞ্জে শিক্ষাপ্রসারে তিনি যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন এবং জেলার মধ্যে যাতে লোকেরা শিক্ষিত হয় সেই দিকে তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। তিনি গোপালগঞ্জের চারিধারে বহু যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং তাঁদের মাহিনা মিশন থেকে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মথুরানাথ একজন পরিদর্শক শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং তাঁর কাজ ছিল বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করা ও মহাপ্রভুর বাণী সহজ-সরলভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া।

গোপালগঞ্জের আশপাশের গ্রামগুলি অজ্ঞতার অন্ধকারে এমনভাবে নিমজ্জিত ছিল যে যখন মথুরানাথ লোকগণনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন সুদূর পল্লীগ্রামে দোয়াত-কলম পর্যন্ত সগ্রংহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। আলতাফ হোসেন-নামক এক মুসলমান ভদ্রলোক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলেন এবং প্রথানুসারে, তাঁর স্ত্রীর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুশ্লীম প্রথামতে স্বামী ধর্মান্তরিত হলে স্ত্রী পুনর্বিবাহ করতে পারেন। বড়দিন পর্বের কয়েকদিন পূর্বে আলতাফ তাঁর শ্বশুরের নিকটে ঘাসের ঘরে দেখা করতে গেলেন এবং মধ্যরাত্রে স্ত্রীকে নিয়ে বার হয়ে এলেন। বড়দিনের পবিত্র দিনে তিনি ও তাঁর স্ত্রী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। ধর্মের উন্মাদনাবশতঃ স্থানীয় মুসলমানেরা এতে হলেন ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত; মিশনারীগণ উত্তেজনা দেখে যারপরনাই ভীত হয়ে আলতাফ সাহেবকে কলিকাতায় প্রেরণ করলেন এবং যখনই কেহ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হ'ত তখনই সেইস্থানে খ্রীষ্টীয়ানের উপরে অকথ্য নির্যাতন চলত।

গ্রীষ্মের সময়ে মথুরানাথ গ্রামে গ্রামে গিয়ে খ্রীষ্টের মহানাম প্রচার করতেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে অভাবগ্রস্ত লোক দেখলে তিনি তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। দুঃস্থ, দরিদ্রদের তিনি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতেন। গোপালগঞ্জের চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্সারীটি মথুরানাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোপালগঞ্জের প্রথম অবৈতনিক বিচারকহিসাবে মথুরানাথ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি একটী সবুজবর্ণের নৌকায় ক'রে প্রচারে যেতেন। প্রচারে গেলে তিনি নৌকায় গান ও প্রার্থনা করতেন। নৌকায় তিনি ৩।৪ দিন অতিবাহিত করতেন। এক সময়ে নৌকাযোগে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তনের

সময় মথুরানাথ লক্ষ্য করলেন যে নদীতীরে একজন নদী পার হবার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি মাঝিদের আদেশ দিলেন তারা যেন ঐ অপেক্ষ্যমান লোকটিকে পার করে দেয়, কিন্তু মাঝিরা বল্লে যে তা' অসম্ভব, কারণ নদীর স্রোত খুব জোরে বইছিল। কিন্তু মথুরানাথ ছাড়বার পাত্র নন, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাকে নৌকায় তুললেন এবং যতক্ষণ সে নৌকায় ছিল ততক্ষণ তিনি খ্রীষ্টের বাণী তার কাছে প্রচার করলেন। এই নৌকাযোগে প্রচার করতে মথুরানাথ খুব ভালবাসতেন—সঙ্গে থাকত আরো কয়েকজন প্রচারক।

একবার তাঁর নৌকার মাঝিরা এসে মথুরানাথকে বল্লে যে লবণ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি তাদের গ্রামবাসীদের নিকটে গিয়ে লবণ চাইতে বললেন কিন্তু তাতে ফল হ'ল না। অবশেষে তিনি নিজে নেমে খ্রীষ্টের বাণী দুই ঘণ্টা যাবৎ প্রচার করলেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর প্রচার শ্রবণ ক'রে গ্রামবাসীরা এত মুগ্ধ হ'ল যে তারা তাঁকে সেখানে থেকে আহার করতে আমন্ত্রণ জানাল। তিনি তাদের বললেন যে তাঁর শুধু একটু লবণ চাই। মাঝিদের তিনি স্মরণ করালেন, প্রথমে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের এবং তাঁর সততার অনুসন্ধান কর এবং পরে সবই তোমাদের দেওয়া যাবে। মিশন কর্মচারীদের মাহিনার বিষয় তিনি কখনও চিন্তা করতেন না, ঈশ্বরের উপরে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং অলৌকিকভাবে টাকা-পয়সা এসে যেত।

এক সময়ে মাসকাবারে তাঁর হাতে মাহিনা দেবার মত কিছুই ছিল না। কর্মীরা যখন মাসের প্রথমে মথুরানাথের কাছে এলেন তখন তিনি নিবিষ্টচিত্তে তাঁদের নিয়ে প্রার্থনায় বসলেন। প্রার্থনার ঠিক পরেই তাঁর নামে এক মণি অর্ডার এল এবং আশ্চর্যভাবে তিনি তাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন। ঈশ্বরের দান এইভাবে এই খ্রীষ্টভক্ত দাস অকাতরে লাভ করতেন। অর্থের অভাবে তাঁর কাজ কখনও বন্ধ হয়নি কারণ অর্থাদি এমন কি যাবতীয় অভাবের জন্য তিনি ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল ছিলেন।

মূলকথা মথুরানাথ নমঃশূদ্রদের মধ্যে সুসমাচার-প্রচারে ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। জীবনের মান-সম্মান, অর্থ, উন্নতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তিনি তাঁর অমূল্য জীবন ব্যয় ক'রে গিয়েছেন খ্রীষ্টের মহাকাজে। এক সময়ে একটী মহিলা ও কয়েকজন নমঃশূদ্র মথুরানাথের কাছে প্রভুর

বাণী শুনতে এসেছিল ; মথুরানাথ তাদের জলখাবারের জন্য একটী টাকা দিলেন এবং তার পরে প্রভুর নাম-গান চলতে লাগল রাত্রি তিনটা পর্যন্ত। মথুরানাথ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু তারা প্রভুর সুসমাচার আরো শুনতে চাইল, ফলে সকাল পর্যন্ত তাঁর কাজ চলতে লাগল।

অনেকদিন পরে সেই মহিলা এবং আরো একজন আত্মীয়স্বজন, ছেলে-মেয়ে, শিষ্য, ঘরবাড়ী ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে।

ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মথুরানাথ মহাভারত মণ্ডলকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। মহাভারত বহুস্থানে তীর্থভ্রমণ করে কিন্তু মনের শান্তি সে লাভ করেনি। অবশেষে সে একজন মোহন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মোহন্ত শিক্ষা দেয়, যেব্যক্তি স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে সে কখনও মুক্তি পাবে না। বাস্তবিকই মহাভারতের জীবন ধর্মের ও শান্তির জন্য চির-লালায়িত ছিল এবং তা সাধনের জন্য সে স্ত্রীর সংস্পর্শ ত্যাগ করেছিল। দীক্ষাগ্রহণ করবার পরে মথুরানাথ অনেক কষ্টে মহাভারতকে স্ত্রীগ্রহণে রাজী করান। একদিন মহাভারতের স্ত্রী একটী বড়, ধারাল ছুরি নিয়ে সহসা মথুরানাথের গৃহে প্রবেশ করে। মথুরানাথ ধৈর্যসহকারে বিছানা থেকে উঠে জানতে চান তার ক্রোধের কারণ। সে মেয়েটী নিজে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। ধর্মপ্রাণ মথুরানাথের অনুরোধে সে তা' করেনি। মহাভারতকে মথুরানাথ প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সামনে দীক্ষিত করেন। তার স্ত্রী পাগলিনীর ন্যায় করতে থাকে এবং তার পর থেকে দিবারাত্রি মথুরানাথ ও সহকর্মীদের গালিগালাজ করে। কিছুদিন পরে মহাভারতের স্ত্রী হঠাৎ এসে ধর্মপ্রাণ মথুরানাথকে বলে যে সে স্বপ্ন দেখেছে আর তাই পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের কথা শুনতে চায়। মহাভারত খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ ক'রে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে। মাঠে চাষের সময়ে সে একাই চাষ করে কারণ নখ্রীষ্টীয়ানেরা তার সাথে কাজ করবে না। সে চাষ করে ও কাঁদে। বিদ্রূপকারীদের মহা-ভারত দৃপ্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, দরকার হলে ধর্মের জন্য জীবন দিতে হবে, জগতের দুঃখকষ্টকে উপেক্ষা ও সহ্য করতে পারলে আমার পরিত্রাণ আছে মহাভারত বলেছিল।

অবস্থাপন্ন নমঃশূদ্রেরা প্রতিমাপূজা ও নৌকাখেলায় টাকা-পয়সা ব্যয় করত কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের জন্য তারা কখনও কপর্দকও ব্যয় করত না। অন্য ধারে মথুরানাথ ও সহকর্মীরা লবণ, চাউল নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ

ক'রে বেড়াতেন। প্রভু খ্রীষ্টের সেবা ও ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে খ্রীষ্টভক্ত দাস মথুরানাথ দরিদ্রের মুখে তুলে দিতেন অন্ন, ও দরিদ্র মূর্খ জনগণ প্রভুর প্রশংসা করত শতকণ্ঠে। আমাদের এই নিঃস্বার্থ সেবাকার্যকে কেউ কখনও প্রলোভন বলতে পারেন না। মথুরানাথ ছিলেন প্রকৃত খ্রীষ্টসেবক, প্রার্থনাশীল ছিল তাঁর জীবন।

৭ই ফেব্রুয়ারী সদননামক কুষ্ঠরোগীকে পবিত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। তার হাত-পা ক্ষতে পরিপূর্ণ ছিল ও ঘায়ে মাছি বসত। মিশন-বাড়ী থেকে তার বাড়ী মাত্র দুই মাইল দূরে ছিল। গ্রামবাসীরা মথুরানাথকে প্রচার করতে বলতেন কিন্তু এই কুষ্ঠীর মত আর কারো এত আগ্রহ ছিল না। সে তাঁকে তার বাড়ীতে বসতে বলত ও শাস্ত্রবাক্য শুনতে চাইত। সে পড়তে পারত ও তাঁর দেওয়া ছোট ছোট বই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করত। তাঁদের সে তার জন্য গান ও প্রার্থনা করতে বলত। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার পরে সদন মথুরানাথের বাসগৃহে সপ্তাহকাল থাকে। নমঃশূদ্রেরা আশ্চর্য হ'ল কি ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলী তার মত কুষ্ঠরোগীকে গ্রহণ করল, যা' অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী কখনও করত না। মথুরানাথ একমাত্র কারণে সদনকে খ্রীষ্টের নিকটে এনেছিলেন তা হ'ল লোকটির প্রভুর উপরে জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাকে ঘায়ে লাগাবার জন্য গর্জনতৈল দেওয়া হ'ল। দিনের পর দিন নব দীক্ষিত খ্রীষ্টভক্ত সদন গান, ধ্যান, প্রার্থনায় দিনরাত কাটাতে লাগল; মনে হয়েছিল যেন সে ঈশ্বরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর ও আকর্ষিত হচ্ছে। অবশেষে সে আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্যলাভ করল। তার দেহে নূতন মাংস হল ও এক কথায় সে নবজীবন লাভ করল। আনন্দের আতিশয্যে সে সগৌরবে উচচরবে বাজারে হাটে প্রভুর কথা বলে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সদন তার নিজ গ্রামে গিয়ে প্রচার করবার মনোবাসনা মথুরানাথকে জানাল। অনেক পরীক্ষায় পড়ল সে, কিন্তু দয়াময় প্রভু তাকে রক্ষা করলেন। তার পরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আবার ভাব-ভালবাসা হল, সে তার ক্ষেতের ধান পেতে লাগল। সে গ্রামেই থাকত ও আপামর জনসাধারণকে প্রভুর বাণী শোনাত। গ্রামবাসীরা তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করত ও আগ্রহ-সহকারে প্রভুর অমিয়বাণী শুনত পরম বিস্ময়ে, ভক্তিভরে। গ্রামের কয়েকজন খ্রীষ্টকে স্বীকার করেছিল। নমঃশূদ্রের উপর থেকে জমিদার ও সরকারের ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব কিছু হ্রাস পায়নি। তারা পড়াশোনায় উৎসাহ

পেত না, কারণ ভাল চাকুরী বা জমিদারের নিকটেও চাকুরীর কোনো সুবিধা পেত না। এ দেশের ধারণা, যারা নমঃশূদ্র তারা চিরকাল নীচ নমঃশূদ্রই থাকবে—তাদের ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকারে থাকবে এই যেন জমিদার ও সরকারের ইচ্ছা। ফরিদপুরের প্রধানশাসক মিঃ W. S. Wells অনেক আগ্রহ ক'রে তাদের জন্য ইংরাজী ও বাংলা স্কুল খুলেছিলেন। কিন্তু নমঃশূদ্রেরা দুঃখের সঙ্গে বলত, পড়ে তাদের কি হবে—তাদের তো কেউ চাকুরী দেবে না। তারা চিরকাল অন্ধকারেই ডুবে থাকবে। এইভাবে অসহায়, দরিদ্র নমঃশূদ্রদের জীবন থেকে সব আশা-আনন্দ নির্বাপিত হতে লাগল। মৃত্যুই যেন তাদের চির-আশা। আমাদের দেশে যত দিন উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ থাকবে, ঘৃণা-জাতিবিদ্বেষ থাকবে, তত দিন দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কখনও সম্ভবপর হবে না। গোপালগঞ্জে মিশনের দুইটি স্কুল ছিল। গ্রামবাসীরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার ভয়ে ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্টীয় স্কুলে পাঠাতো না। ক্রমশঃ সে ভয়, সঙ্কোচ কেটে গেল এবং তারা খ্রীষ্টীয় মিশন স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে লাগল। খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ভাল, discipline উত্তম এই ভেবে তারা পাঠাতে লাগল। যখন স্কুলে পার্বত্য উপদেশ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল, উপদেশের মহত্ত্ব ও গভীরতা দেখে মাতব্বর বা সর্দার আশ্চর্যান্বিত হ'ল। পরে সে মথুরবাবুকে বলেছিল—ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ও বাইবেল শিখে ভালোই হচ্ছে কারণ ভবিষ্যতে সে ও তার পরিবারবর্গ স্বচ্ছন্দে খ্রীষ্টধর্ম নিতে পারবে ও সারাংশ বুঝতে পারবে। মথুরানাথের জীবনাদর্শ আমরা যতই চিন্তা করি ততই বিমুগ্ধ হই। কি তাঁর ধ্যান, আরাধনা ও গানের জীবন! ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখে তিনি অকুতোভয়ে খ্রীষ্টের নাম-গান করতেন। জীবনের উন্নতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে জীবন কাটান দীন, দুঃখী, লাঞ্ছিত ও খ্রীষ্টজ্ঞানপিপাসুদের সহিত। খ্রীষ্টের প্রেম ভয়কে বাস্তবিকই অপসারিত করেছিল। কতজনকে তিনি খ্রীষ্টের চরণাশ্রিত করেছিলেন। দুঃস্থ জনগণ পেয়েছিল তাঁর কাছে অন্নবস্ত্র, জ্ঞানহীন পেয়েছিল জ্ঞান এবং গোপালগঞ্জের জনগণের সাথে তিনি শ্রীখ্রীষ্টের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রার্থনায় তিনি আশ্চর্য কার্য সাধন করেছিলেন। ঈশ্বর যেন মথুরানাথের মত সর্বত্যাগী সাধক আমাদের মধ্যে আবার প্রেরণ করেন।

বিপিনচন্দ্র সরকার

ওগো সুন্দর বিপিনচন্দ্র তোমার চন্দ্রানন,
অরূপ সাধনা কত আরাধনা হরিল সবার মন।
জ্ঞানতপস্বী ওগো সন্ন্যাসী খ্রীষ্টের প্রিয় দাস,
তোমার বিপুল কর্ম্মপ্রতিভা ছড়ায়ে দিল সুবাস।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য বাংলা ভাষায় নব জাগরণের সূত্রপাত করে। ধর্ম ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সেন, বিধবা বিবাহ, মাদক ও সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং হিন্দুধর্মের নব উদ্দীপনায় রামকৃষ্ণ পরমহংস তৎকালে সমাজে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও স্বভাবতঃ এই জাগরণের সাড়া পড়ে। য়ুরোপীয় নীলচাষীদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করে।

এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিপিনচন্দ্রের জন্ম হয় পূর্ববঙ্গের বরিশাল হইতে দশ ক্রোশ উত্তর হবিবপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে।

তৎপরে রাজনীতিক্ষেত্রে যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ-মোহন বসুর আবির্ভাব হয়। তাঁহারা কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' নামে সমগ্র ভারতে প্রথম রাজনীতিক সমিতি স্থাপন করেন। এক জাতীয় সম্মেলন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই উত্তরকালের সর্বভারতীয় জাতীয় মহাসভা (All-India National Congress)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়।

এই পরিবেশের মধ্যে কিশোর বিপিনচন্দ্র তাঁহার শিক্ষাজীবন আরম্ভ করেন। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন ক'রে তিনি বরিশালে উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা (এনট্রান্স) পরীক্ষা দেন। কিছুদিন কুচবিহার কলেজে অধ্যয়ন করিয়া এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় এসে ডাফ

আচার্য বিপিনচন্দ্র সরকার

কলেজে যোগদান করেন এবং এখানে দুইবৎসর অধ্যয়ন করেন; ইহা বর্তমানে স্কটিস চার্চ কলেজ নামে অভিহিত।

মফঃস্বলে থাকাকালে বিপিনচন্দ্র ধর্মমতসম্বন্ধে উগ্র রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় আসবার ও ডাফ কলেজে ভর্তি হবার পর তাঁহার জীবনে এক নব ধর্মভাব দেখা দেয়। তিনি ছাত্রসংঘের সভ্য ও নেতা হ'ন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কারের বিষয় আলোচনার জন্য প্রগতিশীল ছাত্রবৃন্দের এই সংস্থা। ব্রাহ্মসমাজের যখন সর্বাধিক প্রভাব, সেই যুগে বিপিনচন্দ্র উক্ত সমাজের সংস্পর্শে আসেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তাঁহাকে 'ওয়াই. এম. সি. এ.' সমিতির আসরে দেখা যায় একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়। যিশাইয় গ্রন্থের কোন কোন অংশ ও যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৭শ অধ্যায়ের কিয়দংশ আবৃত্তির বিষয়বস্তু ছিল। এই সময় কলেজ ব্রাঞ্চ ওয়াই. এম. সি. এ. ছাত্রসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল; ইহাতে অনুমিত হয় যে, বিপিনও উহার সভ্য ছিলেন। ক্যাম্বেল হোয়াইট তৎকালে সাধারণ কর্মসচিব ছিলেন এবং বি. আর. বারবার, এফ. ডবলিউ. স্টেন্থল ও আচার্য বি. এ. নাগ ছিলেন শাখার কর্মসচিব। ইঁহাদের, বিশেষতঃ ক্যাম্বেল হোয়াইটের প্রভাবে বিপিন 'নূতন নিয়ম' অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন এবং যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হ'ন। তখনও তিনি স্বগ্রামে হবিবপুরে যাতায়াত করেন; অবকাশের সময় সেখানে তিনি যুবকগণের নেতাস্বরূপে তৎকালীন সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য সভার আয়োজন করেন এবং গ্রামীণ লোকের মধ্যে সমাজসেবার কার্য আরম্ভ করেন। কলেজে পাঠকালে নবলব্ধ চিন্তাসমূহ তাঁহার মনকে আন্দোলিত করত এবং ক্রমশঃ তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টের দাবীর প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়। তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা থেকে তাঁহার গভীর ধর্মভাব জানা যায়। সেই সময় তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হ'ন এবং তাঁহাকে পড়াশুনা বন্ধ করতে বলা হয়। এতে তিনি অস্বীকৃত হ'ন এবং ক্রমে ক্রমে দুর্বল হতে থাকেন। একরাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন যে, ক্যানিং ষ্ট্রীটে পর্তুগীজ উপাসনালয়ের সন্নিকটে একটি দোকানের বাহিরে পথিপার্শ্বে একজন ফকির বসে আছেন; পর পর দুইরাত্রিতে এইরূপ স্বপ্ন দেখেন, প্রতিবারেই ফকির বিপিনকে পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতে বলেন। বিপিনচন্দ্র প্রথমবার স্বপ্নটা

কলেজে যোগদান করেন এবং এখানে দুইবৎসর অধ্যয়ন করেন; ইহা বর্তমানে স্কটিস চার্চ কলেজ নামে অভিহিত।

মফঃস্বলে থাকাকালে বিপিনচন্দ্র ধর্মমতসম্বন্ধে উগ্র রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় আসবার ও ডাফ কলেজে ভর্তি হবার পর তাঁহার জীবনে এক নব ধর্মভাব দেখা দেয়। তিনি ছাত্রসংঘের সভ্য ও নেতা হ'ন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কারের বিষয় আলোচনার জন্য প্রগতিশীল ছাত্রবৃন্দের এই সংস্থা। ব্রাহ্মসমাজের যখন সর্বাধিক প্রভাব, সেই যুগে বিপিনচন্দ্র উক্ত সমাজের সংস্পর্শে আসেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তাঁহাকে 'ওয়াই. এম. সি. এ.' সমিতির আসরে দেখা যায় একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়। যিশাইয় গ্রন্থের কোন কোন অংশ ও যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৭শ অধ্যায়ের কিয়দংশ আবৃত্তির বিষয়বস্তু ছিল। এই সময় কলেজ ব্রাঞ্চ ওয়াই. এম. সি. এ. ছাত্রসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল; ইহাতে অনুমিত হয় যে, বিপিনও উহার সভ্য ছিলেন। ক্যাম্বেল হোয়াইট তৎকালে সাধারণ কর্মসচিব ছিলেন এবং বি. আর. বারবার, এফ. ডবলিউ. স্টেন্থল ও আচার্য বি. এ. নাগ ছিলেন শাখার কর্মসচিব। ইঁহাদের, বিশেষতঃ ক্যাম্বেল হোয়াইটের প্রভাবে বিপিন 'নূতন নিয়ম' অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন এবং যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হ'ন। তখনও তিনি স্বগ্রামে হবিবপুরে যাতায়াত করেন; অবকাশের সময় সেখানে তিনি যুবকগণের নেতাস্বরূপে তৎকালীন সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য সভার আয়োজন করেন এবং গ্রামীণ লোকের মধ্যে সমাজসেবার কার্য আরম্ভ করেন। কলেজে পাঠকালে নবলব্ধ চিন্তাসমূহ তাঁহার মনকে আন্দোলিত করত এবং ক্রমশঃ তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টের দাবীর প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়। তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা থেকে তাঁহার গভীর ধর্মভাব জানা যায়। সেই সময় তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হ'ন এবং তাঁহাকে পড়াশুনা বন্ধ করতে বলা হয়। এতে তিনি অস্বীকৃত হ'ন এবং ক্রমে ক্রমে দুর্বল হতে থাকেন। একরাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন যে, ক্যানিং ষ্ট্রীটে পর্তুগীজ উপাসনালয়ের সন্নিকটে একটি দোকানের বাহিরে পথিপার্শ্বে একজন ফকির বসে আছেন; পর পর দুইরাত্রিতে এইরূপ স্বপ্ন দেখেন, প্রতিবারেই ফকির বিপিনকে পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতে বলেন। বিপিনচন্দ্র প্রথমবার স্বপ্নটা

ততো গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় দিনের পর তিনি ফকিরের নিকটে যাওয়াই স্থির করেন। অপরাহ্নে ক্যানিং ষ্ট্রীটে গিয়া স্বপ্নে দেখা সেই-স্থানটি দেখতে পান কিন্তু ফকিরকে দেখতে পান না। চতুর্দিকে অন্বেষণের পর ফকিরের দেখা পেলে ফকির বলেন, সকালে আসনি কেন? এই বলে তিনি চলে গেলেন। বিপিনচন্দ্র কাশীপুর ঘাট পর্যন্ত ফকিরের অনুসরণ করেন, তখন ফকির বলেন, সে আরোগ্যলাভ করেছে। বিপিন তবু ফকিরের সঙ্গে সঙ্গে যেতে থাকেন কিন্তু ফকির আপত্তি জানালে তিনি ফিরিয়া আসেন। কিন্তু সেইদিন হতেই বিপিন সুস্থ বোধ করতে থাকেন।

তৎপরে আসে, তাঁহার নিকটে খ্রীষ্টের দাবী। একদিন তিনি অভ্যাসমতো নির্জনে চলে যান এবং উপবাসী থেকে প্রার্থনায় রত থাকেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। অপর দিন তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন এবং এক আশ্চর্যদর্শন দেখেন: প্রভু যীশু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তিনি তাঁহাকে উঠিয়ে বসান ও আপন সেবায় আহ্বান জানান। ইহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থির হ'ল। কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি ক্যাম্বেল হোয়াইটকে তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন ও জলদীক্ষা-গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

এই সুস্পষ্ট আশ্চর্য অভিজ্ঞতা উত্তরকালে তাঁহার জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুণে আচার্য ডবলিউ. এফ. গ্রে. কর্তৃক বাপ্তাইজিত হন। খ্রীষ্টীয়ান হইয়া তিনি নাম পরিবর্তন করেন নাই বা নূতন নাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার গ্রামের তিনিই প্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা-লাভ করেন; গ্রামে হৈচৈ পড়ে যায়। বিপিন ইহার পূর্বে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন কিরণবালা দাসকে; তাঁহার স্ত্রী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।

ধর্মান্তর গ্রহণের পরে তিনি রেঙ্গুণে সম্পাদকরূপে মিঃ অলিভার ম্যাককাউনের সাথে সমিতির উন্নয়নমূলক কার্যে যোগদান করেন। তথায় কার্যকালীন তাঁরই চেষ্টায় শহরে ছাত্রদের একটী শাখা খোলা হয়। বাড়ী-ভাড়া দেবার জন্য সেখানে একটী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এক-বৎসর কাল তিনি বিনা বেতনে কার্য চালিয়ে যান। শাখাকেন্দ্রটি মাঝে মাঝে এমন অর্থনৈতিক চাপে পড়ে যে, ছোট গৃহটির ভাড়াও অনেক সময়

দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেই শাখাকেন্দ্র যে গৃহে অবস্থিত ছিল, তার মালিক জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক এক সময়ে তিনমাসের ভাড়া না পাওয়ায় যখন ক্ষুব্ধ হ'ন, তখন বিপিনচন্দ্র সারাদিন প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন। এই ঘটনার বিষয় শুনে মালিক এতই অভিভূত হ'ন যে তিনি যে কোনো সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত রইলেন ও অবশেষে ডিরেক্টরগণ যথেষ্ট চাঁদা তুলে দেনা শোধ করেন ও কিছু টাকা সঞ্চিত রাখেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুণে হিন্দুস্থানী-মণ্ডলীতে কাজ করবার উদ্দেশ্যে বাইবেল ট্রেণিং নেবার জন্য রেঙ্গুণের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরা তাঁকে ক্যানাডার টরোনটোতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তিনি দু'বছর বাইবেল ট্রেণিং নিলেন ও আর একবছর আইওয়া খ্রীষ্টীয়ান কলেজে পড়ে প্রাচীন-সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী পান। রেঙ্গুণের ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলী ও জাডসন কলেজে কাজ করবার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে টরোনটোর ইম্মানুয়েল চার্চে অভিষিক্ত হন। টরোনটোর স্থানীয় কাগজে তাঁর অভিষেক-সম্পর্কে লেখা হয়েছে: তিনি তাঁর মধুর খ্রীষ্টীয় ভাবের দ্বারা স্থানীয় মণ্ডলীর সভ্যদের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

দেশে ফিরে রেঙ্গুণের হিন্দুস্থানী-মণ্ডলীতে তিনি প্রায় একবছর পালকের কাজ করার পরে ওয়াই. এম. সি. এ.-এর আহ্বানে কলিকাতা কলেজ-শাখার একজন সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। বারবার, হার্ট, ষ্টেন্হল, গারফিল্ড উইলিয়ামস্, ফারকুহার প্রভৃতির সঙ্গে ছ'বছর কাজ করেন। তাঁর জোরালো ও স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রভাব কলেজ ষ্ট্রীটের ওয়াই. এম. সি. এ.-তে স্থায়ী হ'ল। এই সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। তিনি প্রতি শনিবারে কলেজ স্কোয়ারে ছাত্রদের জন্য একটা সভার আয়োজন করতেন ও বক্তৃতা দিতেন।

এইসমস্ত স্মরণীয় বৎসরে বিপিনচন্দ্র তাঁর প্রাণমন দিয়ে বাঙ্গলা-মণ্ডলীকে সাহায্য করেন এবং কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে তাঁর আহ্বান আসে। ইণ্টালী ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের তিনি অবৈতনিক পুরোহিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম ইণ্টালী-চার্চে এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। **Bengal Evangelistic League**-এর সম্পাদক-হিসাবে তিনি বহুদিন কার্য করেন এবং গোপালগঞ্জে একটী স্বদেশী মণ্ডলী পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। বহুবার

ধুতি-চাদরে আবৃত হয়ে বিপিনচন্দ্র গ্রামবাসীদিগকে খ্রীষ্টের অতুলনীয় প্রেমের বাণী শোনাতেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিপিনচন্দ্র বঙ্গীয় Christian Council League-এর সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টীয় সভাসমিতি পরিচালনা করেন। সারা বঙ্গদেশে তিনি যুবজনগণের 'গুরুজী' ছিলেন। টোকিওতে ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ জে. আর. চিতাম্বর, এফ. কিংস্‌বেরী, ডাঃ কর্মকার প্রভৃতির সমভিব্যাহারে World's Student Christian Federation-এর সভায় যোগদান করেন। বিপিনচন্দ্র Garfield Williams, Arthur Davies, Backhouse প্রভৃতিকে ভারতসেবায় আহ্বান করেন এবং তাঁরা ভারতে আগমন ক'রে ভারতের খ্রীষ্টীয় আন্দোলনকে জোরদার করেন। এইসমস্ত প্রতিনিধি সাংহাইতে Missionary Conference-এর শতবার্ষিকী সভায় যোগদান করেন এবং তৎপরে এক বক্তৃতা ও উপদেশ-অভিযানে টোকিওতে গমন করেন। বিপিনচন্দ্র এক মাসকাল তাঁর সরস, সজীব ও জোরালো কথায় চতুর্দিকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

এই কাজের পরে তিনি আবার কলেজ ষ্ট্রীটে, Y.M.C.A.-এর কাজে পূর্ণ উদ্যমে যোগদান করেন এবং দিবারাত্রি তার কাজে নিযুক্ত থাকেন। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিচারক সারদাচরণ মিত্রের সহায়তায় ভারতে সর্বপ্রথম এক মহতী ধর্মসভার আহ্বান করেন।

টাউন হলের এই সভায় বহু ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে বিপিনচন্দ্র চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে খ্রীষ্টের বাণীকে ভারতীয় ভাবধারার সংমিশ্রণে উপযুক্তরূপে ভারতে প্রচার করা যায়।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর বিপিনচন্দ্র সমিতির কলেজ-শাখার কার্যে অধিকতর আগ্রহে ও উৎসাহে ব্রতী হ'ন; আহারাদির সময় ঠিক থাকে না, রাত্রদিন কাজ আর কাজ। এই সময় থেকে ভারতে খ্রীষ্টীয় সুসমাচার-প্রচারের নূতন ধারার কথা ক্রমশঃ তাঁহার মনকে অধিকার করতে থাকে। একদিকে যে পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছেন তাহার প্রভাব, অন্যদিকে তখন বঙ্গদেশে স্বাদেশিকতার প্রভাব তাঁহার অন্তরকে আলোড়িত করে। বন্ধুবান্ধবগণের নিকট তিনি প্রায়ই এ বিষয়ে তাঁহার নবলব্ধ চিন্তাধারার কথা বলতেন; বারাণসী বা পুরীতে একটি 'খ্রীষ্টীয় আশ্রম' স্থাপনের বিষয়

SERAMPORE

উল্লেখ করতেন; ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিশনারী কন্‌ফারেন্সের এক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধে তিনি তাঁহার এইসকল চিন্তা ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধে তিনি সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কারণ, মিশনারীদের প্রতি ক্রম-বর্ধমান বিরূপতা এবং ভারতবাসীর জীবনের সহিত মিশনারীদের সংযোগের ও সহানুভূতির অভাব—এইসকল কথার উল্লেখ করেন। আরও বলেন যে, এখনও ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম 'বিদেশী ধর্ম' বলে পরিগণিত, উহার পদ্ধতি-সমূহ ও উপাসনা-রীতি প্রায় সবই বিদেশী; খ্রীষ্টধর্মকে ভারতের পক্ষে উপযোগী ক'রে না নিলে, ভারতের জীবনকে উহা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি খ্রীষ্টীয় আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র ওয়াই. এম. সি. এ. সমিতির কর্মসচিবরূপে পরিচালন-কার্য হতে মুক্ত হইয়া সরাসরি ধর্মীয় কার্যে আত্মনিয়োগের চিন্তা করেন; তাঁহার সমস্ত সময় এই কার্যে ব্যয় করার, এমন কি 'সাধু'র ন্যায় সাদাসিধা জীবন যাপন ক'রে সুসমাচার-প্রচার করার বিষয় তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটিকে পত্র লেখেন যে, তাঁহাদের মিশনে প্রচারকার্যের অধিকতর সুযোগ আছে, এই বিশ্বাসে তিনি উক্ত মিশনে মিশনারীর কর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ডাঃ মট ও মিঃ শেরউড্ এডি তাঁহার এই ইচ্ছার বিষয় জ্ঞাত হয়ে তাঁহাকে কলেজ-শাখার কার্য হতে মুক্ত ক'রে ওয়াই. এম. সি. এ. সমিতির বিশেষ ধর্মপ্রচারকরূপে নিযুক্ত করবার প্রস্তাব করেন; মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে ও হিন্দুসমাজে যেরূপ ইচ্ছা কার্য করতে তাঁহার স্বাধীনতা থাকবে। অনেক বিবেচনার পর তিনি ইহাতে সম্মত হ'ন; তিনিই ওয়াই. এম. সি. এ. সমিতির প্রথম জাতীয় ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত হ'ন।

এইবার তাঁহার পারিবারিক বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অশ্বিনী সরকার মহাশয়। অশ্বিনী সরকার মহাশয়ের স্ত্রী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান, বিপিনচন্দ্রের স্ত্রী তাঁহার শিশুপুত্র সতীন্দ্রলালের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এসে এই পরিবারভুক্ত হ'ন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু পনের দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিপিনের অন্য কোন সন্তানসন্ততি ছিল না, সুতরাং এই ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তাঁহাদের

সকল স্নেহের ভাগীদার হ'ন। ধর্মবিষয়ে তাঁহার কোন পীড়াপীড়ি ছিল না, কিন্তু খুল্লতাতের জীবনাদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া ইঁহারা উভয়েই খ্রীষ্টীয় দীক্ষাগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে গঙ্গায় ঠিক যেস্থানটিতে প্রথম বাঙ্গালী হিন্দু কৃষ্ণ পাল, ডক্টর উইলিয়ম কেরীর হস্তে খ্রীষ্টীয় দীক্ষাগ্রহণ করেন, ঠিক সেইস্থানে মহেন্দ্র বিশপ আজারায়া ও ডক্টর আর্কুহার্ট কর্তৃক অবগাহিত হ'ন। পরে গিরিডিতে সতীন্দ্র বাপ্তাইজিত হ'ন। (মহেন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যক্ষ এম. এল. সরকার, এবং সতীন্দ্র উক্ত কলেজের অবসারপ্রাপ্ত অন্যতম অধ্যাপক।)

ওয়াই. এম. সি. এ.-এর কলেজ-শাখার কর্ম পরিত্যাগ ক'রে বিপিনচন্দ্র গিরিডিতে বসবাস করতে থাকেন। এইস্থানে কলিকাতাবাসী কয়েক-জন ব্রাহ্ম ও হিন্দু ভদ্রলোক গৃহ নির্মাণ ক'রে বাস করতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ গ্রীষ্মাবকাশে বায়ুপরিবর্তনের জন্য আসেন। স্থানটি গাছ-পালায় ভরা, নিকটেই পর্বতশ্রেণী, তাহার উচ্চতম শিখর পরেশনাথ প্রখ্যাত; প্রসিদ্ধ জৈনকেন্দ্র, অনেক হিন্দু ও জৈন জনসাধারণের বিশেষ তীর্থক্ষেত্র। বিপিনচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্মিণী স্থানটি পছন্দ করতেন এবং সেখানে বহু-লোকের সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত স্থানেই থাকেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিপিনচন্দ্র সর্বভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করতে আরম্ভ করেন; দেশের সর্বত্র তিনি পরিভ্রমণ করতে থাকেন; যেস্থানে যাইতেন সেস্থানে খ্রীষ্টীয়ান ও অখ্রীষ্টীয়ান বহুলোক সভাতে তাঁহার মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করত। মাদ্রাজে খ্রীষ্ট-সমাজের সহিত তাঁহার যোগাযোগ হয়; তাঁহার আদর্শ ও রুচি উক্ত দলের আদর্শ ও রুচিসম্পর্কে সমভাবাপন্ন; তিনি তাঁহাদের ভাবধারার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সভাতে তাঁহাদের সাহায্য করতেন। ১৯১৫ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রচার-অভিযান-সম্পর্কে তিনি মাদ্রাজ-প্রদেশে বহু বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে শিক্ষিত লোকদের নিকট ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন এবং শ্রোতৃবর্গের অন্তরে গভীর রেখাপাত ক'রে খ্রীষ্টীয় কর্মীবৃন্দের জন্য তিনি বাইবেল শিক্ষার আয়োজন করেন; সেইসময় তাঁহাদের জন্য যে পাঠ্য তিনি রচনা করেন, তাহা পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়—নাম 'মনুষ্যধারী' (*Fishers*

of Men); এই বইখানি বহু ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং প্রচার-অভিযান-সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।

তৎপরে তিনি বঙ্গে ও উড়িষ্যায় মণ্ডলীসমূহে উদ্দীপনার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। দেশের এই অংশ তাঁহার সুপরিচিত। জনগণ তাঁহার মাতৃভাষা বাংলায় প্রদত্ত বক্তৃতা মন দিয়া শ্রবণ করতেন; এইখানেই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্যের কতক সম্পন্ন করতে সমর্থ হ'ন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে বিশেষ প্রচার-অভিযান পরিচালনা করেন এবং অভূতপূর্বভাবে মণ্ডলীগুলি অনুপ্রাণনা লাভ করেছিল; দলে দলে যুবকেরা তাঁহার নিকট আসতেন ও অনেকে অবৈতনিকভাবে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এই সময়ে যে সুন্দর উদ্দীপনার কার্য তিনি করেছিলেন তজ্জন্য ব্যাপ্টিষ্ট-মিশন-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কার্যবিবরণীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

খ্রীষ্টসমাজ-সম্পর্কে তিনি মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে যেতেন, তাঁহাদের বার্ষিক সভায় যোগদান করতেন। এইসকল সভায় তাঁহার শাস্ত্রালোচনা মৌলিকতা ও সজীবতায় প্রখ্যাত হয়ে আছে। তৎকালে উহা গভীরভাবে লোকের মনে রেখাপাত করে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়াই. এম. সি. এ.' সমিতির আন্তর্জাতিক কমিটির আমন্ত্রণে তিনি পুনরায় আমেরিকা গমন করেন, যেন ভারতে সমিতির কার্যে লোকের আগ্রহ ও সাহায্যলাভ করা যায়। তিনি আমেরিকা ও কানাডার সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং সমিতিকে এই কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য দান করেন। বহুদিন পরেও তাঁহার বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ও হাস্যোদ্দীপক কাহিনী-গুলি স্মরণ করিয়া সেখানকার লোকে তাঁহার কথা আলোচনা করত।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব-নাগরিক সম্মেলনে যোগ-দানের নিমিত্ত তৎকালীন স্টেট সেক্রেটারী তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন, এবং ভারতে প্রত্যাগমনের পথে তিনি এই সভায় যোগদান করেন।

বিপিনচন্দ্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতরভাবে এই বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হইয়া-ছিলেন যে, খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও বাণী ভারতকে তাঁহার নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে; অধিকন্তু, তিনি বুঝেছিলেন যে, এই উদ্যমে তাঁহাকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ছয়মাসের জন্য

তিনি কলিকাতায় কলেজ-শাখার ভার পুনরায় প্রাপ্ত হন এবং তথায় আশ্রম-প্রণালী অনুসারে উপাসনাদি পরিচালনা করতে থাকেন; এইসকল উপাসনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন (বর্তমানে ভারত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট), ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতি অনেক নেতৃস্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোক উপস্থিত থাকতেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে বিপিনচন্দ্রের নশ্বর দেহকে পাচম্বা-নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। স্কটিশ মিশন হাসপাতালের ডাক্তার Dempster তাঁর বাড়ীতে শেষ উপাসনা করেন; ব্রাহ্ম-সমাজের ডাক্তার ভি. রায় সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং ডাঃ আর্কুহাট, যিনি ছিলেন Scottish Church College-এর অধ্যক্ষ, তিনি সমাধির উপাসনা সমাধিস্থানে সম্পন্ন করেন। সারা গিরিডি শহরের বিশিষ্ট জনগণ শবানুগমন করেন। অবশেষে তিরোহিত হলেন একজন দাস, যিনি প্রভুকে প্রাণ-মন দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন এবং যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বহু বন্ধু-বান্ধব লাভ করেছিলেন।

পুরীর আশ্রম Y.M.C.A.-এর হস্তে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে এতদিন যথাসম্ভব বিপিনচন্দ্রের আদর্শমত আশ্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছিল। এখন এ আশ্রম N.M.S. চালাচ্ছেন। পুরীতে যে সুন্দর আশ্রমটি তিনি স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যে এবং যাঁরাই তাঁর মধুর হাস্যময় পবিত্র সংস্পর্শে এসেছিলেন, বিপিনচন্দ্রের স্মৃতি তাঁদের মধ্যে চিরজাগ্রত আছে। প্রতি বুধবারে সন্ধ্যায় বিপিনচন্দ্রের বন্ধুরা গিরিডিতে সমবেত হয়ে তাঁদের প্রিয়বন্ধু ও খ্রীষ্টভক্ত দাসের জন্য স্মৃতি-উপাসনা করেন। সে এক অশ্রুসজল বেদনার স্মরণ-চিহ্ন!

বিপিনচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হ'ল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় আদর্শের সমন্বয় বা সম্মিলন; সেই সম্মিলনে ছিল পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ—প্রাচ্যবাসীরা যে সংমিশ্রণ সানন্দে গ্রহণ করেছিল। আজ ভারতবাসীরা যখন তীব্র জাতীয়তাবাদে পরিপূর্ণ তখন বিপিনচন্দ্রের কথা শ্রদ্ধাসহকারে আমরা মনে ক'রে উপলব্ধি করি যে, তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল কত প্রখর। খ্রীষ্টধর্মের re-orientation বা পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সংমিশ্রণের সফল স্বপ্ন তিনি বহুপূর্বে দেখেছিলেন, সেইজন্য প্রাচ্যভাবে বিমণ্ডিত খ্রীষ্টধর্ম ভারতবাসীর

অন্তরাত্মাকে স্পর্শ ক'রে সাড়া পাবেই। বিপিনচন্দ্র ছিলেন হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্ট-ধর্মের মিলনকারী। তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টীয় ও বিদেশী মিশনারীর দুই ভাবের সংমিশ্রণকারী; বিভেদ নিয়ে তিনি আত্মতুষ্ট ছিলেন না বা বিরোধের বীজ তিনি বপন করতেন না। তিনি বিদেশী ও ভারতীয় খ্রীষ্টীয় কর্মীর ও মণ্ডলীপরিচালকের ছিলেন পরম সুহৃদ। আজ খ্রীষ্টমণ্ডলীর সম্মুখে যেসব গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে ভারতীয়করণ বা জাতীয়করণ একটী বড় সমস্যা যা সহজে বিপিনচন্দ্র সাধন করেছিলেন। এ বিষয় ঠিক যে, এখনও আমাদের বিদেশী মিশনারীদের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বর্তমান এবং বিপিনচন্দ্র তার সহজ সমাধান আগেই ক'রে গিয়েছেন। খুব কম খ্রীষ্টীয় নেতা এই জাতীয়করণের দিকে সঠিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন কিন্তু 'জাতীয়করণ' সমস্যাটি কয়েক বৎসর যাবৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য তিনি সমস্যাটির সমাধানের জন্য প্রকৃত পথ খুঁজেছিলেন।

প্রতি মানুষের জীবনের প্রারম্ভ থেকে আমরা কিছু কিছু ভাবের অঙ্কুর দেখতে পাই যা ভবিষ্যৎ জীবনকে ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইসব ভাব হয় শিক্ষাদীক্ষা থেকে অথবা গৃহের বা পরিবারের আবহাওয়ার দরুণ গঠিত হয়। বিপিনচন্দ্রের এই দুই মনোভাবই গঠিত হয়েছিল, ফলে খ্রীষ্টধর্ম ও আদর্শসম্বন্ধে তাঁর ধারণা পৃথক্ ছিল। তিনি অন্যদের ভাব অনুকরণ করতেন না, তাঁর চিন্তাধারা ছিল পৃথক্ ও বলিষ্ঠ। প্রতিটি সমস্যা ও কর্মপদ্ধতি তিনি নিজে পরীক্ষা করতেন এবং জীবনে জ্বলন্ত সত্য বলে গ্রহণ করতেন। বাইবেল ও মহাপ্রভু খ্রীষ্টের আদর্শ তিনি শুধু বই থেকে গ্রহণ করেননি কিন্তু পবিত্র আত্মার চালনায় তাঁর হৃদয়-মন সুগঠিত হয়েছিল। খ্রীষ্টের শিক্ষাকে তিনি মনের অভ্যন্তরে নিয়ে দিনে দিনে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় সুগঠিত ও সংগঠিত করেন। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা বিপিনচন্দ্রের ছিল, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের সন্ধানে ও ধ্যানে দিনের পর দিন নিমগ্ন থাকে। বিপিনচন্দ্রের ধর্মজীবনের প্রধান বিষয় ছিল—তাঁর ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞান ও ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ। তিনি বলতেন, ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক জীবনে নীরবতার উপরে অধিক জোর দেওয়া

হবে। একজন লোক দুই-তিন বৎসর নীরবতা পালন করলে জীবনে অনেক কিছু অর্জন করতে পারে। বিপিনচন্দ্র বলতেন, নীরবতার মধ্যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি ধ্যান-ভক্তি সাধনার উপরে সবিশেষ জোর দিতেন। বর্তমান সভ্যতার গতিবাদ তাঁকে পীড়া দিয়েছিল তাই গিরিডিতে নীরবতার মধ্যে গৃহ-নীড় বেঁধেছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে নীরবে সহভাগিতা ক'রে তিনি প্রচুর আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতেন।

দেশের তীব্র জাতীয়তাবোধকে তিনি অন্যায় মনে করেননি। তাঁর জাতীয়তাবোধকে তিনি কার্যে প্রকাশ করেন ভারতীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদের মধ্যেও প্রভু যীশুই ছিলেন প্রকৃত আদর্শ ও গুরু। তিনি নিজেকে ঈশা-পন্থী বলতেন। গুরুর নাম তিনি কোনও দিন গোপন করেননি। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মাঝে সে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ঈশা-পন্থী আশ্রম—আমরা পূর্বে দেখেছি কি গভীরভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বিপিনচন্দ্রের মনোভাবকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিভাবে মনে-প্রাণে স্বদেশী হয়ে প্রভু খ্রীষ্টকে ভারতবাসীর নিকটে প্রাচ্যভাবে উপস্থাপিত করা যায়, তাই ছিল এই দেশপ্রেমিকের আকুল স্বপ্ন। কলিকাতা মিশনারী কনফারেন্সে তিনি সে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, যা' পরে পুরীর ঈশা-পন্থী আশ্রমে রূপায়িত হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনও কর্মী গ্রামে গিয়ে ভারতীয় আশ্রম-জীবন পালন করতে পারেন। তাঁর অধিকাংশ সময় যাবে ধ্যান, প্রার্থনা ও সাধনায়; অপর কাজ হবে দুঃস্থ-রুগ্ন আর্তজনের স্বার্থশূন্য সেবা—এইভাবে তিনি গ্রামবাসীর হৃদয় জয় করতে পারেন। তিনি থাকবেন সম্পূর্ণ পরসেবা নিয়ে এবং সর্বসময়ে তাঁকে সকলেই পাবে। তিনি নিজের কথা মোটেই চিন্তা করবেন না, পরের হিত-চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে থাকবেন। নীরবে ধ্যানের জন্য তিনি হবেন স্বল্পভাষী ও তাঁর কথা ও বাক্যালাপ হবে জ্ঞানভাণ্ডার ও অনুসন্ধিৎসুর পথপ্রদর্শক। লোকেরা তাঁর কাছে জ্ঞানের কথাই শুনতে আসবে। ধর্মান্তরের দিকে তাঁর যতটা না ঝোঁক থাক, তাঁর উদ্দেশ্য হবে শিষ্যত্ব

লাভ করা। তাঁর শিষ্যরাও হবে এক কথায় গুরুর দাসানুদাস। অনুসন্ধিৎসু জনের সঙ্গে নেতার সম্পর্ক হবে গুরু ও শিষ্যের। অনুসন্ধানকারীরা গুরুকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করবে ও সেইভাবে শিষ্যের মতই তাঁরা তাঁকে ভক্তি করবেন। খ্রীষ্টীয় এই সম্পর্ক আবার আমাদের গড়ে তুলতে হবে, তবেই উত্তম খ্রীষ্টীয় কর্মী গঠিত হবে। আজিকার দিনে প্রতি মণ্ডলীতে ভেদাভেদ, হিংসা, একদল যুবক কর্তৃক গুরুজনকে উপেক্ষা ও অপমান, সভ্যগণ কর্তৃক পুরোহিতনিয়ন্ত্রণ, মিশনারীদিগের অন্যায় সমালোচনা, এই সমস্ত ভাব দেখা যায়। তবে এ কথাও ঠিক যে, গণতন্ত্রের যুগে যুবকগণ চাইবেন যেন পুরোহিতও সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত হ'ন। দুঃখের কথা, অনেক পুরোহিত ও গুরুজনের মধ্যে নেতৃত্বের ও পরিচালনাগুণের অভাব দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে বিদেশী মিশনারীদিগের কিছু অভারতীয় ও জাতীয়তাবিরোধী ভাবের জন্য তাঁরা সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্রের মতে হিন্দুধর্ম থেকে আগত খ্রীষ্টীয়ান তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন অটুট রাখবেন। নখ্রীষ্টীয়গণ খ্রীষ্টধর্মে দেখবেন তাঁর ধর্মজীবনের পরিপূরণ। ধর্মান্তরিত ব্যক্তি পরসেবায়ও নূতন জীবন যাপন করবেন। ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁরা পরস্পর আলোচনা করবেন। অনেক সময় তাঁরা পরস্পর আলোচনা ক'রে ধর্মের কঠিন বিষয়গুলির সমাধান করবেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্রকে কলেজ ষ্ট্রীটের Y.M.C.A.-এর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়। তার মধ্যে একটী কামরায় প্রার্থনা, ধ্যান ও সম্মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। কিছুদিন পরে বিপিনচন্দ্র ত্রিশজন বিশিষ্ট শিক্ষিত খ্রীষ্টীয় যুবক নিয়ে গঠিত করলেন 'The Brotherhood' বা 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ'; প্রতি শুক্রবারে ভ্রাতৃসঙ্ঘের অধিবেশন হ'ত। ধ্যান, প্রার্থনা-সঙ্গীত ছিল তাঁদের প্রধান অনুষ্ঠান। এখানে Dr. Radhakrishnan (এখন President) ও University-র Professor Dr. Barua নিয়মমত আসতেন।

হিন্দু সাধুদের জীবনধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার জন্য বিপিনচন্দ্র বারাণসী, বুদ্ধগয়া ও প্রয়াগ পরিভ্রমণ করেন এবং সাধুদের সহিত যোগাযোগ করেন। তিনি যে খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী একথা প্রকাশ্যে তাঁদের বলেছিলেন,

কিন্তু তাতে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়নি। পুরীর বাজারে একখানি ঘরে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রুশার্পণের একটী ছবি ও তার নীচে ছিল বেদী ; সেখানে টেবিল, চেয়ার ছিল না ও সকলে জুতা খুলে যেতেন। সূর্যাস্তে যখন হাজার হাজার ঘণ্টা বেজে ওঠে তখন খ্রীষ্টমন্দিরেও ধূপ জ্বলে ওঠে। ভজনালয়ে ঘণ্টা বেজে ওঠে, প্রার্থনা-গানে, স্তবে, আরাধনায় মুখরিত হয়ে ওঠে চতুর্দিক। স্তব-আরাধনার পরে সকলে নীরবে ধ্যানে খ্রীষ্টকে স্মরণ করেন। বিপিনচন্দ্র এই পরীক্ষা দেখে আশ্রমগুলির আশপাশে একখণ্ড জমি কিনলেন। পুরীর মন্দিরের নিকটে ৪ একর জমি কিনলেন। সেখানে একটী কুটীর ও খ্রীষ্টমন্দির তৈয়ারী করা হ'ল। মন্দিরে একটী ঘর ছয় ফুট, চতুষ্কোণ, এবং উপরে ছিল একটী গম্বুজ ও তার উপরে ক্রুশ। ভিতরের দেয়ালেও একটী বড় ক্রুশ-চিহ্ন আবদ্ধ ছিল। চল্লিশজন ভিতরে বসতে পারতেন। ক্রমশঃ নিষ্ঠাবান বিপিনচন্দ্র কয়েকটী কুটীর নির্মাণ করলেন আশপাশে এবং অতিথিদের জন্য একটী ছোট বাংলো। ঈশ্বর তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। জীবনের শেষ সঞ্চয় ৬,০০০৲ টাকা বিপিনচন্দ্র খরচ করলেন, এতে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। এমন দিন গিয়েছে যখন তাঁর আশ্রয়-গৃহ ছিল না, গাছতলায় তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। কখনও বহু আয়াসে তাঁকে খাদ্যসংগ্রহ করতে হ'ত এবং ছাতা মাথায় দিয়ে বর্ষাকালে অনেক সময় কাটাতে হ'ত। হিন্দুরা স্বেচ্ছায় আশ্রমে এসে নতশির হয়ে ক্রুশকে প্রণাম করতেন। পুরীর বহুজনের কাছে বিপিনচন্দ্র ছিলেন অতি প্রিয়বন্ধু। ধনী-নির্ধন সবার সাথে ছিল তাঁর অবাধ মেলামেশা এবং লোকে তাঁকে ঈশ্বরের সেবক বলেই জানত।

অপরিমেয় শক্তির আধার বিপিনচন্দ্র, কি প্রাচ্য দেশীয় কি পাশ্চাত্য দেশীয়, সবার সঙ্গেই মিলে-মিশে চলতে পারতেন। তাঁর জীবন ও ধ্যানের উৎস ছিলেন খ্রীষ্ট মহাপ্রভু, এবং তাঁকে তিনি এ দেশবাসীর সহিত সযত্নে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক প্রাচ্যভাবেই। ভারতবাসী বিশেষ ক'রে তাঁর তীব্র জাতীয়তাবোধ, আশ্রম-জীবন, ধ্যান ও আরাধনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। আশ্রমজীবনের নীরবতার মধ্যে লব্ধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তাঁকে স্থায়ী আসন দেয়। বিদেশী ও জাতীয় মিশনারীর মধ্যে তিনি রচনা করেন মিলন-সেতু। নদী, সাগর, পাহাড়-ঘেরা ধ্যানমুগ্ধ ভারতে তিনি অপূর্ব নিষ্ঠার

হিত প্রাচ্য ভাবে ও আদর্শে প্রাচ্যের খ্রীষ্টকে, প্রেমের ও ত্যাগের খ্রীষ্টকে চার করেন ভক্ত ভারতবাসীর মনে। ঈশ্বর তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। বপিনচন্দ্রের ত্যাগ ও সাধনা ও তাঁর কার্য দেশের মধ্যে চির-জাগরূক থাকবে।

তাঁর জীবন তিরোহিত হলেও তাঁর সেবা ও খ্রীষ্টভক্তি অমর হয়ে আছে। Y.M.C.A.-র H. A. Popley লিখিত *Bepin Chandra Sircar, The Reconciler* বইখানিতে তাঁর বিস্তৃত জীবনী আছে। The Christian Literature Society for India বইখানি ১৯৩১ সালে ছাপাইয়াছিলেন।

অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টের দাস, জ্ঞানরঞ্জন, তোমার ভক্তি প্রেম,
আজিকার দিনে, যত অভাজনে, ছড়ায়ে দিল যে হেম,
তোমার প্রতিভা, জ্ঞান ও নিষ্ঠা সবে সমাদর করে,
খ্রীষ্টসমাজে তোমার আলোক মণিকার মত ঝরে।

প্রাতঃস্মরণীয় জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পরলোকগত আচার্য প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কাশ্মীরের বিশিষ্ট অফিসার শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বাবা প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ডাফ কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হ'ন। তিনি এক জমিদার-বংশোদ্ভূত, যাঁরা তেলেনিপাড়ার ব্যানার্জ্জী বলে খ্যাত ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাঁকে সমাজচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করা হয়। শুধু তাই নয়, পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ ক'রে প্রায় ভিখারীর অবস্থায় পথে দাঁড়াতে হয়। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী স্বামীর অনুরাগিনীর মত ক্রমশঃ হিন্দু-প্রথাগুলি ত্যাগ করতে থাকেন। একাদশীর দিন তিনি নদীতে ডুব দিয়ে হাতের নোয়া ফেলে দেন এবং কপালের সিঁদূর-চিহ্ন মুছে ফেলেন। ঈশ্বর তাঁদের ৫০ বৎসর সুখী পারিবারিক জীবন দান করেন।

জ্ঞানরঞ্জন এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে প্রভুর জন্য উৎসর্গীকৃত হলেন। যখন তিনি প্রথমে ভাল-মন্দর মধ্যে পড়লেন তখন শিক্ষা পেলেন যে খ্রীষ্ট যীশুর জন্য কোনো ত্যাগই মহৎ নয়, তা' অবশ্যকরণীয়। পরিবারের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, তাঁর উপরে তিনটি ভগ্নী ছিলেন। প্রথম থেকে জ্ঞানরঞ্জন অনুভব করলেন যে ঈশ্বর তাঁর দয়া ও করুণায় মানুষকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারেন।

তিনি হুগলীর অন্তর্গত সোনাটিকরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে মাটীর কুঁড়ে ঘরে জ্ঞানরঞ্জন প্রথম জীবনের আলোক দেখেন সে ঘরটি ছিল অত্যন্ত

অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যাঁতসেঁতে ও ভিজা। ফলে শিশু জ্ঞানরঞ্জনের ভীষণ ঠাণ্ডা লাগে ও সেজন্য তিনি কিছুদিন চোখের পাতা খুলতে পারেননি। এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে তাঁর মা আশা হারাণনি কিন্তু কাতর-প্রার্থনা করেন, "হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, আপনি যদি সত্যই ঈশ্বর হ'ন তবে আমার পুত্রকে দয়া ক'রে সুস্থতা দান করুন।" তখনও মাতা কাদম্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসের প্রথমধাপে ছিলেন। মায়ের কাতর-প্রার্থনা ঈশ্বরের কর্ণগোচর হ'ল এবং আশ্চর্যভাবে তিনি প্রার্থনার সাড়া পেলেন। ক্রমশঃ তিনি জানতে পারলেন যে জ্ঞানরঞ্জন ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সেবায় আহূত। সোনাটিকরি থেকে প্রসন্ন-কুমার বংশবাটীতে (হুগলী) বদলী হলেন; এখন বংশবাটী একটী শ্রম-শিল্পের স্থান বলে বিখ্যাত। স্থানীয় মিশন-স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন প্রসন্নকুমার। কৈশোরে জ্ঞানরঞ্জন লেখাপড়ায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে লাগলেন এবং অবশেষে তাঁকে বড় ভগ্নীর কাছে শ্রীরামপুরে পাঠানো হ'ল; যাতে জ্ঞানরঞ্জন ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারেন তজ্জন্য তাঁকে সেখানে মাতাপিতা পাঠিয়েছিলেন। তিনি হলেন **Mrs. B. L. Bose** যাঁর স্বামী ছিলেন বিখ্যাত ইংলণ্ড-প্রত্যাগত চিকিৎসক। শ্রীরামপুরে তিনি চিকিৎসা-ব্যবসা করেছিলেন। শ্রীরামপুরে জ্ঞানরঞ্জন পড়াশোনায় মাত্র ১০ বৎসর বয়সে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাতে লাগলেন। এই অল্প বয়সে তিনি চার্চের ইতিহাস পড়া শেষ করেন। এই সব লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে জ্ঞান-রঞ্জনের কোন্ দিকে আকর্ষণ ছিল। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তিনি একটী সিনিয়র স্কলারশিপ বা বৃত্তি লাভ করেন এবং অঙ্কে পূর্ণ নম্বর ও ইংরাজীতে খুব অধিক নম্বর পান। ইতিমধ্যে জ্ঞানরঞ্জনের পিতা প্রসন্নকুমার কলিকাতা **Duff School**-এ বদলী হ'ন সুতরাং জ্ঞানরঞ্জন স্বভাবতঃই **Duff College**-এ পড়াশোনা করতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ বছর বয়সে পরীক্ষায় অতীব সাফল্যের সহিত তিনি শুধু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ননি কিন্তু ডাফ স্কলারশিপও লাভ করেন। যে ছাত্র সকল ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন তাঁকেই ডাফ স্কলারশিপ দেওয়া হ'ত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞান-রঞ্জন ডাফ কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ পরীক্ষায় জ্ঞানরঞ্জন ইংরাজী

এবং দর্শনে first class বা প্রথম শ্রেণীতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হ'ন। তিনি মহারাজা ভিজিয়ানাগ্রাম স্কলারশিপ লাভ করেন। বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারীকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হ'ত। জ্ঞানরঞ্জনের এইরূপ অসাধারণ সাফল্যে তাঁর ঈশান স্কলারশিপের যোগ্যতা ছিল কিন্তু ঐ সম্মান অহিন্দুকে দেওয়ার রীতি ছিল না। দাতার নিয়মানুসারে ঐ বৃত্তি কেবলমাত্র বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান প্রাপ্তকে দেওয়া হ'ত। ইংলণ্ডে যাবার জন্য জ্ঞানরঞ্জনকে State Scholarship দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মা তাঁকে ইংলণ্ডে যেতে দেননি ; কারণ তাঁর ধারণা ছিল সমুদ্রপারে গেলে যুবকেরা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জ্ঞানরঞ্জনের ইংলণ্ডে যাবার অদম্য বাসনা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন Oxford-এ গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেবেন। সমস্যা দাঁড়াল জ্ঞানরঞ্জন মায়ের বাধ্য হবেন অথবা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি সূচিত করবেন। অবশেষে তিনি মায়ের মনঃকষ্ট না দিয়ে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা ত্যাগ ক'রে ইংলণ্ডে যাবার কথা বিস্মৃত হলেন। এইরূপ মাতৃভক্তি খুবই বিরল। এই সময় জ্ঞানরঞ্জন Duff College-এর ডাঃ হেনরী ষ্টিফেনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি দর্শন-শাস্ত্র (philosophy) অধ্যয়নে রত হ'ন এবং বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। তৎপরে প্রায় আড়াই বছর পরে তিনি B.L. ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ২৪-পরগণা জেলার কোর্টে আইনজীবীর ব্যবসা সুরু করেন। তবে তিনি মনে-প্রাণে আইনজীবী হতে ইচ্ছা করেননি। শিক্ষকতার দিকে তাঁর মনোভাব ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট হতে লাগল। শিক্ষকতাকার্যে দক্ষতা দেখাতে পারলে তিনি প্রভুর চরণে শিক্ষা-ব্রতী যুবকদের আনতে সক্ষম হবেন এই কথা চিন্তা করেছিলেন।

পূর্বকালে অধ্যাপকদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল। জ্ঞানরঞ্জন অনুমান করলেন যে ছাত্রদের প্রিয় হতে পারলে তিনি তাদের অধ্যাপনায় মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবেন এবং তাদের কাছে বাইবেলশাস্ত্রের অমিয়-বাণী সহজে প্রচার করতে পারবেন।

জ্ঞানরঞ্জনের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ও কৃতী ছাত্রকে Duff College-এর মিশনারীগণ অত্যন্ত অল্প মাহিনা দিতে চাইলেন

কিন্তু তাঁদের সঠিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। সেই সময়ে, যখন জিনিসপত্র অপেক্ষাকৃত সুবিধা-দামে পাওয়া যেত, সেই অল্প বেতনে জ্ঞানরঞ্জনের খাওয়া-পরার খরচও কুলাত না, এমনই দুর্ভাগ্য! ঠিক সেই সময়ে তিনি Judicial Department অথবা বিচার বিভাগে ভাল চাকুরীর সুযোগ পেলেন; কিন্তু উত্তম মাহিনা সত্ত্বেও জ্ঞানরঞ্জন সে চাকুরী গ্রহণ করেননি। যখন তিনি অধ্যাপনাকার্য করবার সুযোগ খুঁজছিলেন তখন পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী Metropolitan Institute-এর পরিচালক ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের কর্তৃপক্ষ তখন একজন জ্ঞানী, গুণী ও কৃতী অধ্যাপকের সন্ধান করছিলেন; জ্ঞানরঞ্জনকে তাঁরা ইংরাজী ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন। কলেজের ভাল অর্থবল ছিল না বলে অধ্যাপকদের সংখ্যাও কম ছিল। মাঝে মাঝে তাঁকে ইতিহাস ও অর্থনীতিও পড়াতে হ'ত। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন আজকালকার মত ছিল না; সুতরাং অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা খুব কৃতী ছিলেন তাঁদের একাধিক বিষয় অধ্যাপনা করতে দেওয়া হ'ত। এ সময়ের পরে যখন আইন-কানুন কঠিন করা হয়েছিল তখন জ্ঞানরঞ্জন ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপনা বন্ধ ক'রে দেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত জ্ঞানরঞ্জন অনার্স-এর (Honours) ইংরাজীর অধ্যাপনা করতেন। আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর M.A.-তে ইংরাজী না থাকাতেও তিনি অনার্স-এর ইংরাজী পড়াতেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানরঞ্জন গ্রীক দর্শনের স্বল্পকালীন অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। তিনি ইংরাজী ও বাংলার মত গ্রীক ভাষাও দখল করেছিলেন। পরবর্তী কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গ্রীক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

তিনি জীবিতকালে বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতার Anti-smoking Society-র ২০ বৎসর সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি প্রায় ২৫ বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি প্রায় ৪৫ বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন। রিপন কলেজেও প্রায় ৪ বৎসরকাল তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে তিনি General Assembly কলেজে দুই বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন। এই কলেজটি প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ Alexander Duff প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথমে সেটী গঙ্গার ধারে অবস্থিত

ছিল পরে Scottish Church College-এর সহিত সংযুক্ত হয়। তিনি আরো দুইটী হিন্দু স্কুলের সভাপতি ছিলেন। একটি ছিল Oriental Academy, অপরটি Atheneum Institution। জ্ঞানরঞ্জনের মৃত্যুর পরে উপরোক্ত স্কুলে তাঁর তৈলচিত্র রাখা হয়। প্যালেডিয়াম এসিওর‍্যান্স কোম্পানীতে তিনি কিছুদিন সভাপতি ছিলেন। শ্রীরামপুর থিওলোজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ২০ বৎসর *Senatus*-এর সভ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজে যখন আইন-শাখা খোলা হয়েছিল তখন তিনি সেখানে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে প্রায় ১৫ বৎসর কাল তিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় ট্রাক্ট সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে অনেক সুন্দর খ্রীষ্টীয় আদর্শের পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় কাউন্সিলেরও সভাপতি-পদ ৮ বৎসর যাবৎ অলংকৃত করেন। তাঁর নেতৃত্বে সে সময়ে কাউন্সিল মূল্যবান কাজ করেছিল। তিনি ২৫ বৎসর সিনেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts-এর Dean নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ৩ বৎসরকাল তার সদস্য ছিলেন।

খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনুগত্য অটুট ছিল। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের একজন সাহসী যোদ্ধা এবং সাহসের সহিত প্রভুর কথা সর্বসমক্ষে প্রচার করতেন। যাঁরা খ্রীষ্টকে ভক্তি-বিশ্বাস করতেন না জ্ঞানরঞ্জন তাঁদের নিকটে আরো আগ্রহের সঙ্গে সুসমাচারের বাণী প্রচারে ব্রতী হতেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন অন্যদের সঙ্গে জ্ঞানরঞ্জন বিডন স্কোয়ারে প্রভুর বাণী প্রচার করেছিলেন তখন সহসা ইটপাটকেল দ্বারা আক্রান্ত হ'ন। প্রাণভয়ে তাঁরা এধারে-ওধারে ছুট্‌তে লাগলেন, অবশেষে একজন মুসলমানের মাংসের দোকানে প্রবেশ ক'রে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। সেই মুসলমান মাংস-বিক্রেতা তখন বীর-বিক্রমে তাদের প্রতিরোধ করে এবং অতি কষ্টে তার মাংস কিমা করবার chopper দিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকে এবং জ্ঞানরঞ্জন কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন চট্টগ্রামে বাইবেল সুসমাচার প্রচারে রত ছিলেন তখন একদল বিক্ষুব্ধ, ধর্মান্ধ মুস্লীম জনতা তাঁর উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আক্রমণে উদ্যত হয়। চট্টগ্রামে জ্ঞানরঞ্জন কলেজ ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং

সুযোগ পেয়ে প্রভু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের সময়ে সাহসের সঙ্গে বলেছিলেন যে ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ; কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীরা কখনও বলতে পারেননি যে তাঁদের ধর্মপ্রবর্তকেরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলেন। দৃঢ়চিত্তে এই কথা প্রকাশ করায় মুশ্লীম জনগণের সেই কথা ভালো লাগেনি তাই তারা জ্ঞানরঞ্জনকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে উঠেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টভক্ত দাস তেজস্বিতার সহিত খ্রীষ্টের নিষ্পাপ জীবনের কথা প্রচার করেন। কলিকাতার ও মফঃস্বলের বহু খ্রীষ্টীয় ধর্ম-মন্দিরের বেদী থেকে জ্ঞানরঞ্জন খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যের কথা ও মুক্তির বাণী প্রচার করেন। কত দুঃখসন্তপ্ত চিত্ত তাঁর উপদেশামৃতে অমৃতের সন্ধান লাভ করে। তিনি কখনও অন্য ধর্মের সহিত খ্রীষ্টের আদর্শকে একাসনে রাখেননি। সকল সময়ে তিনি মহাপ্রভুকে উচ্চতম আসনে রাখতেন এবং সেজন্য কতবার তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছিল। বিভিন্ন খ্রীষ্টমণ্ডলীতে জ্ঞানরঞ্জন মহাপ্রভু খ্রীষ্টকে রেখেছিলেন উচ্চতম শিখরে এবং সঙ্গীতরচনা ও উপদেশের সময়ে মুক্তিদাতা খ্রীষ্টের নাম ও গুণগান সর্বসময়ে দেখতে চাইতেন। বহুবার বহুস্থানে কি গানে কি উপদেশে যেখানে খ্রীষ্টের নামকে উপেক্ষা করা হ'ত বা যেখানে নাম উল্লিখিত হ'ত না সেখানে প্রভুভক্ত দাস জ্ঞানরঞ্জন প্রতিবাদের ঝড় তুলতেন। সঙ্গীতরচনা যতই মধুর ও ছন্দময় হোক না কেন, বর্ণচ্ছটায় যতই উজ্জ্বল, সুরমাধুর্যে যতই মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, তাতে প্রভু খ্রীষ্টের নাম অঙ্কিত না থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়, এই ছিল তাঁর অটল ও দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর মতে সেই মধুরসংলাপী সঙ্গীত মনোহারিত্বের দাবী করলেও তা খ্রীষ্ট সঙ্গীত নয়—তা' যে কোনো নখ্রীষ্টীয় সভাসমিতি অথবা ব্রাহ্ম-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত, এই ছিল তাঁর একান্ত ধারণা।

মহিলা-শিক্ষা প্রসারে জ্ঞানরঞ্জনের অসীম আগ্রহ ছিল। ছাত্রদের ন্যায় ছাত্রীদের শিক্ষায় অগ্রগতি হোক এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। তিনি মনে করতেন যে মেয়েদের শিক্ষা-প্রসার ভিন্ন দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নয়, কারণ মহিলারা অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়ে থাকলে দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কখনও দূরীভূত হবে না। সুতরাং আমাদের দরিদ্র, কুসংস্কারবদ্ধ ও অশিক্ষিত দেশ কখনও দৃঢ়ভাবে উন্নতি করতে সক্ষম হবে না। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষহিসাবে তাঁর সর্বমুখীন প্রচেষ্টায় ঐ কলেজে

একটী মহিলা-বিভাগ স্থাপিত হয়। মহিলা-বিভাগের জন্য সর্বপ্রথমে জ্ঞানরঞ্জনের প্রচেষ্টার কথা আমাদের মনে পড়ে। ঐ মহিলা-বিভাগের প্রাতঃকালীন ক্লাশে প্রায় ৫০০ মহিলা পড়াশোনা করতেন। এখন বিলুপ্ত Christian Endeavour বা খ্রীষ্টীয় উদ্যোগ-সমিতির তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান এককালে বহু সুন্দর প্রচারমূলক কাজে ব্যাপৃত ছিল। দুই বৎসর অন্তর খ্রীষ্টীয় উদ্যোগ-সমিতির অধিবেশন বসত এবং জ্ঞানরঞ্জন একটীর সভাপতিত্বও করেছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সরকারমনোনীত খ্রীষ্টীয় সদস্যহিসাবে তিনি তিন বৎসর-কাল কার্য করেন ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। সেই সময়ে ভারতে জাতীয়ভাবের বৃদ্ধি হতে থাকে এবং যুবকদের অন্তরে দেশপ্রেম চির প্রজ্বলিত হয়। কর্পোরেশনে জ্ঞানরঞ্জন জাতীয়তাবাদ সমর্থন করতেন। তিনি কর্পোরেশনে কংগ্রেসদলকে সমর্থন করতেন এবং সেইজন্য দ্বিতীয়বার সরকারী মনোনয়ন লাভ করেননি। তিনিও স্বর্গীয় সতীশচন্দ্রের মত স্বাধীনচেতা খ্রীষ্টীয় নেতা ছিলেন এবং বিবেকবুদ্ধিকে কখনও বিসর্জন দেন নাই। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতখ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। জ্ঞানরঞ্জন অনেক সময়ে প্রকাশ্যেই সিনেটে স্যার আশুতোষের নীতির বিরোধিতা করতে পশ্চাৎপদ হতেন না। এককথায় তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। বহুবার স্যার আশুতোষ যখন একনায়ত্বের ভাব দেখাতেন বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ ইচ্ছামত কিছু করবার প্রচেষ্টা করতেন তখন আই-এ ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক জ্ঞানরঞ্জন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ও যুক্তিপূর্ণ কণ্ঠে সে নীতির করতেন সুদৃঢ় প্রতিবাদ। কোনো এক বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাবশালী সভ্যের পুত্র আই-এ পরীক্ষা দিচ্ছিল। ঐ ছাত্রটী এক বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশ্ন-পত্রের উত্তর দেয়। জ্ঞানরঞ্জন প্রধান পরীক্ষকহিসাবে পূর্বেই পরীক্ষক-দিগকে কয়েকটি নিয়ম-কানুন ও উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সেগুলি ছিল সঠিক, যুক্তিসঙ্গত ও উত্তম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ প্রভাবশালী সভ্য কিন্তু চেয়েছিলেন যে জ্ঞানরঞ্জন যেন ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন যাতে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ইংরাজী-পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারে। জ্ঞানরঞ্জন অবগত ছিলেন যে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করলে ঐ বিশিষ্ট ভদ্রলোক পরে

কোন প্রস্তাবের দ্বারা জ্ঞানরঞ্জনকে মুস্কিলে ফেলবেন। সুতরাং দৃঢ়চেতা জ্ঞানরঞ্জন ঐ ভদ্রলোকের কথামত কিছুতেই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে রাজী হলেন না। অবশেষে জ্ঞানরঞ্জনকে ঐ প্রধান পরীক্ষকের পদটি ত্যাগ করতে হয়; কারণ দেখা গেল পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জ্ঞানরঞ্জন ছিলেন সত্যের ও খ্রীষ্টের আদর্শে বিশ্বাসী পুরুষ; সুতরাং অন্যায়, অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্ব তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে কিছুতেই হতে দেননি। এই মন্তব্যগুলি দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনোভাবে ছোট বা হীন করবার ইচ্ছা আমাদের নাই কিন্তু জ্ঞানরঞ্জনের সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি গভীর ভক্তি-বিশ্বাসকে দেখান হয়েছে। এই কার্যে অর্থাৎ পদত্যাগে জ্ঞানরঞ্জনের প্রায় দুইহাজার টাকা আয় কমে যায়, কিন্তু তিনি কখনও নিজ আদর্শপথ থেকে দূরে সরে যাননি। বিবেক-বুদ্ধিমত তিনি যা' ভাল বা যুক্তিসম্মত বলে মনে করতেন জ্ঞানরঞ্জন একনিষ্ঠ-ভাবে তাই ক'রে যেতেন। এই কর্মের ফলে তাঁর বহুবার বহু অর্থক্ষতি হয়েছে, অনেক সময় তিনি জনগণের নিকটে অপ্রিয়ও হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাবশালী সভ্যগণ বহুবার অন্যায়ভাবে তাঁর দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করতেন। কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ অনেক সময়ে এইভাব দেখাতেন যে দৈনন্দিন কার্যপরিচালনা অধ্যক্ষের অধীনে ছিল; সুতরাং অন্যায়-হস্তক্ষেপ তিনি কখনও অনুমোদন করতেন না। সুতরাং অধ্যক্ষের অধিকার তিনি কখনও সংকুচিত হতে দেননি।

স্বাধীনচেতা জ্ঞানরঞ্জনের চরিত্রকে বুঝতে হলে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। তাঁর জীবন এমনি, যা গঠিত হয়েছিল কঠোর ধ্যান, তপস্যা, ধর্মজীবন ও অধ্যবসায়ে, এবং তা' কখনও সহজে ভেঙ্গে পড়ত না, এই ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য; কাজেই জ্ঞানরঞ্জনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে আজীবন সংগ্রাম চলেছিল তা' অন্যকিছু নয়, তা' গণতন্ত্র ও প্রকৃত জ্ঞানীর শিক্ষালব্ধ ফল। এই আজীবন সংগ্রামের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানরঞ্জনের জীবনের বৈশিষ্ট্য ও দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল।

বিদ্যাসাগর কলেজের পূর্বতন নাম ছিল Metropolitan College। ঐ কলেজটী অধ্যক্ষ এস. রায় ও পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সহায়তায় জ্ঞানরঞ্জন গড়ে তুলেছিলেন। যখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপন কলেজ স্থাপন করলেন তখন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে অনেক জ্ঞানী, গুণী ও প্রভাবশালী অধ্যাপকদের নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে সেই সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পেতে লাগল। তার প্রধান কারণ আগেই বলা হয়েছে। খ্রীষ্টের আদর্শ ও ভক্ত-দাস জ্ঞানরঞ্জন বিপদের সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজ পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র গেলেন না কিন্তু অর্থকষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁরই কলেজ বিদ্যাসাগর কলেজের সেবা নীরবে ক'রে যেতে লাগলেন। এই নীরব-নিষ্ঠা ও কলেজের প্রতি ভক্তি-আসক্তি ছাত্রদের কাছে তাঁকে ক্রমশঃ জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। জ্ঞানরঞ্জনের অধ্যাপনার বিশেষ ধারা, অবিচল নিষ্ঠা ও সাধনা, ছাত্রদের প্রতি অসীম ভালবাসা ও জ্ঞান-বিতরণ বিশেষভাবে ইংরাজী ও দর্শনের অধ্যাপনা অতি শীঘ্রই জ্ঞানরঞ্জনকে ছাত্রদের অন্তরের দুয়ারে পৌঁছে দিল এবং ক্রমশঃ বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রসমাজ আবার ভীড় ক'রে আসতে লাগল। কলেজের প্রতি গভীর আস্থা, বিশ্বাস ও আনুগত্য জ্ঞানরঞ্জন মহাপ্রভু খ্রীষ্টের আদর্শ থেকে পেয়েছিলেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরই জীবনাদর্শ অনুসরণ তিনি করেছিলেন। তা' ছাড়া জ্ঞানরঞ্জন ছাত্রদের নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন ও সর্বদাই তাঁর সাহায্যের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই গভীর ভালবাসা ছাত্রদের মন আকৃষ্ট করে, তারাও ভীড় ক'রে তাঁরই বিদ্যাসাগর কলেজে আসতে থাকে। বহু বৎসর জ্ঞানরঞ্জন নিজের পূর্ণ বেতন পাননি, কারণ কলেজের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না; কিন্তু হাসিমুখে তিনি সব খরচ কমিয়ে ছাত্রদের সেবা ক'রে যান। দারুণ আর্থিক সংকটেও তিনি হাসিমুখে তাঁর কর্তব্যপালন করে যেতে লাগলেন। দারিদ্র্য তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। ছাত্রসংখ্যার ক্রমোন্নতির কথা আগে বলা হয়েছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কলেজ ত্যাগ করেন তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,০০০ এবং ৫০০ মহিলা ছাত্রী। বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীরা শুধু সাহিত্য, বিজ্ঞান ও আইন অধ্যয়ন

করবে, এ ধারণা জ্ঞানরঞ্জনের ছিল না ; তিনি চেয়েছিলেন বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী-দের সর্বতোমুখী প্রতিভা অর্থাৎ commercial বা ব্যবসায়িক বিষয়গুলিও তারা যেন অধ্যয়ন করে। বাঙ্গালী যেন ব্যবসায়ে স্থিতিশীল হতে পারে এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। সন্ধ্যাকালে সেইজন্য জ্ঞানরঞ্জন B.Com. ক্লাশ সুরু করেন ও যথেষ্ট সাড়া পান। Commerce-এর ছাত্রবৃন্দ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে আসবে তা' তিনি জানতেন। যেসব ছাত্র অফিসে চাকুরী করতেন তাঁদের উন্নতি ও সুবিধার জন্য B.Com. পড়ানোর ব্যবস্থা চালু হ'ল। সুতরাং অফিসে চাকুরী ক'রেও বাঙ্গালী ছাত্রগণ B.Com. পড়ার সুযোগ পেলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের এই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আজকাল অসংখ্য ছাত্রছাত্রী B.Com. অর্থাৎ কমার্শিয়াল বিষয় শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে উন্নতি লাভ করছেন। এই-ভাবে দেশের একাউণ্টেণ্ট ইত্যাদি পদেও আমাদের ছাত্ররা অধিক অর্থ উপার্জন করছেন।

জ্ঞানরঞ্জন ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। সুদীর্ঘ সময় তিনি নিরলসভাবে অধ্যাপনা ক'রে যেতেন—এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ খুব অল্পই দেখা যায়। আর একটী গভীর বাসনা তাঁর ছিল, তা' হ'ল প্রভু খ্রীষ্টকে জগতে প্রচার করা।

এই আকুল বাসনা সব সময় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত এবং তিনি প্রভুকে প্রচার ক'রে মনে গভীর আনন্দলাভ করতেন। খ্রীষ্টের প্রেমবাণী জ্ঞান-রঞ্জনকে বিমোহিত করেছিল এবং প্রচার না করলে তিনি শান্তি পেতেন না।

তাঁর প্রচারে বহু জনসমাগম হ'ত এবং শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে খ্রীষ্টের অমৃত বাণী ও ত্যাগের কথা শুনতেন। কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত Students' Hall-এর একজন নিয়মিত বক্তা ছিলেন জ্ঞানরঞ্জন। কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিত Overtoun Hall, Y.M.C.A.-ও একটী তাঁর প্রচারস্থল ছিল। বহুবার বাগ্মী জ্ঞানরঞ্জন খ্রীষ্টের ক্রুশীয় বাণী প্রচার ক'রে শ্রোতা-দিগকে মুগ্ধ ক'রে রাখতেন। তিনি মফঃস্বলেও প্রচারে যেতেন ও এই-ভাবে খ্রীষ্টসমাজের সেবা ক'রে গিয়েছেন। কোনো সময়ে তাঁকে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখা যেত না। হয় পড়াশোনা, নয় ছাত্রদের শিক্ষা-দান কিম্বা খ্রীষ্টের বাণী-প্রচার বা খ্রীষ্টীয় সভা-সমিতি করা এইভাবেই সারা

দিনটি অতিবাহিত হ'ত। তিনি শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কিন্তু বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, আন্ধ্রা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পরীক্ষক ছিলেন। B.A. পরীক্ষায় ইংরাজীর তিনটি প্রশ্নপত্রের তিনি সভাপতি হিসাবে দক্ষতাসহকারে কাজ করেন। শ্রীরামপুর কলেজের Dr. George Howells-এর মত তিনিও শ্রীরামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের theology বা ধর্মের পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীরামপুর থিওলজিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনি আইনের পরিদর্শক-অধ্যাপক (Visiting Lecturer) ছিলেন। যদিও জ্ঞানরঞ্জন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনো ভাষায় Doctorate উপাধি লাভ করেননি তথাপি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত thesis-গুলি পরীক্ষা করতেন ও নিজস্ব মতামত দিতেন। সুতরাং Doctorate উপাধি না পেয়েও জ্ঞানরঞ্জন thesis-এর পরীক্ষক ছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জ্ঞান-প্রতিভার কতটা মূল্য দিতেন। এই বিশ্বাস ও দায়িত্বভার শুধু জ্ঞানরঞ্জনের উপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচল বিশ্বাস ও পাণ্ডিত্য-স্বীকার নয় পরন্তু সত্য প্রতিভার স্বীকার। কারণ তাঁর মত অগাধ পাণ্ডিত্য ও সাধনা কয়জন মনীষীর ছিল? যত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ঈশ্বর খ্রীষ্টভক্ত জ্ঞানরঞ্জনের উপরে অর্পণ করে-ছিলেন। ধন্য হয়েছিল তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালী জাতি ও খ্রীষ্টীয় সমাজ এই বিরাট প্রতিভাকে লাভ ক'রে। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph.D. উপাধিও জ্ঞানরঞ্জনের পরীক্ষার পরে দেওয়া হ'ত।

জ্ঞানরঞ্জন যা বিশ্বাস করতেন তাই প্রচার করতেন এবং কার্যতঃ তাই পালন করতেন নিজ জীবনে। তাঁর একটী বড় চিন্তাধারা ছিল যে তিনি যদি অপরাধীকে কখনও ক্ষমা না করেন তবে ঈশ্বরও তাঁকে ক্ষমা করবেন না। যাঁরা জ্ঞানরঞ্জনের নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি কখনও তাঁদের প্রতি শত্রুতাচরণ করতেন না এই ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। যাঁরা তাঁকে আন্তরিকভাবে জানতেন তাঁরাই বলতে পারেন জ্ঞানরঞ্জন মোটেই প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না; তাঁর ধৈর্য, ক্ষমা ও প্রেম বাঙ্গলা দেশে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্যের কথা শুনলে স্বতঃই মহাপ্রভু খ্রীষ্টের আদর্শের কথা মনে পড়ে। প্রতিদিনই তিনি খ্রীষ্টের একটী সুসমাচারের কাজ করতেন এবং তা' দেখাতেন নিজ জীবনাদর্শ দিয়ে। তিনি যা' বলতেন দৈনন্দিন জীবনে তাই পালন করতেন।

জীবনের শেষ দশায় কলেজে জ্ঞানরঞ্জন কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন রেছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের কর্মপরিষদের কিছু অনুদার সভ্য-দের নিকটে তাঁকে একাধিকবার ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল একথা লালে সত্যের অপলাপ করা হবে না। Governing Body-র সভ্যগণের গছে তাঁকে একরকম বিনা কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। ধ্যাপকদের মধ্যেও সকলকে আমরা সাধুবাদ দিতে পারি না ; কারণ তাঁরাও ব সময়ে খ্রীষ্টভক্ত জ্ঞানরঞ্জনকে ভালো দৃষ্টিতে দেখতেন না। কি জানি ানরঞ্জনের আদর্শনিষ্ঠা ও খ্রীষ্টভক্তির সঙ্গে এই ঘৃণার কোনো সম্পর্ক ছিল কি না। যাই হোক এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে জ্ঞানরঞ্জন সম্পূর্ণ ধৈর্যসহকারে খ্রীষ্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রদর্শন করেন-নি। জ্ঞানরঞ্জনের সময়ের বিদ্যাসাগর কলেজের সহঃ অধ্যক্ষ খুব নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে খ্রীষ্টান জ্ঞানরঞ্জন যেন খুব মনঃপূত ত না তাঁর। কিন্তু জ্ঞানরঞ্জন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হলেও অনেক হিন্দু-ভদ্রলোক াঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন, সেইজন্য সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন অধ্যাপক ও সহঃ ধ্যক্ষ সাহসপূর্বক তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলতে পারতেন না। Governing Body-র কিছু অনুদার সভ্য ভিতরে ভিতরে দল াকাতে লাগলেন এবং জ্ঞানরঞ্জনের বিরোধী হয়ে উঠলেন। অনেক বিষয়ে তাঁরা জ্ঞানরঞ্জনের কাজের অযথা ও অন্যায় সমালোচনা করতেন। াঁরা এমন এক আইন ও প্রস্তাব আনলেন, যাতে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা াকলেও ৬০ বৎসর বয়সে কলেজের অধ্যাপককে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা বে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগর কলেজের উন্নতিতে ৎসর্গীকৃতপ্রাণ জ্ঞানরঞ্জনের বিরুদ্ধেই উহা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু তিনি এ স্তাবে ব্যথিত হলেও চাঞ্চল্য প্রকাশ করেননি, কোনো দল গঠনও করেননি, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে আস্থা রেখেছিলেন। জ্ঞানরঞ্জনের কলেজে াকুরী গ্রহণের সময়ে যে ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করতে হবে তখন এ স্তাব ছিল না। তাঁকে সহজেই আরো পাঁচ বৎসর অধ্যাপনা করতে দেওয়া যত। ধৈর্যবান জ্ঞানরঞ্জন এই হীনপ্রস্তাবকে শান্তভাবে গ্রহণ করলেন, কানো প্রতিহিংসার ভাব তাঁর মনে জাগেনি। খ্রীষ্টের মহান আদর্শে বিশ্বাসী ই দাস অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন বোধ

করেননি। কারণ তাতে কলেজেরই ক্ষতি সাধিত হ'ত। বিদ্যাসাগর কলেজ যখন চরম অর্থসংকটের সম্মুখীন তখন ত্যাগী এই অধ্যাপক সামান্য বেতনে নিষ্ঠাভরে অধ্যাপনা করেছিলেন এজন্য কোনোরূপ বিরূপভাব প্রদর্শন করেন নাই।

Judicial Service বা বিচারকের কাজ পেয়েও তিনি কখনও তা গ্রহণ করেননি। সরকারী কলেজে অধ্যাপনার সুযোগও জ্ঞানরঞ্জনকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যে কলেজের জন্য তিনি এত পরিশ্রম করেছেন ও যার সেবা আজীবন করে এসেছেন তাকে কি কখনও ছেড়ে যাওয়া যায়? অধিক অর্থের প্রলোভনও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক আহূত হয়েও তিনি English-এর readership পদমর্য্যদা গ্রহণ করেননি। অর্থ সব সময় তাঁর কাছে বড় ছিল না কিন্তু ছিল এক মহান আদর্শ। এই আদর্শ রক্ষার জন্য কত সময়ে তাঁকে অর্থাভাব ও মুস্কিলে পড়তে হয়েছে, কিন্তু তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কিন্তু এত ত্যাগ স্বীকার করেও জ্ঞানরঞ্জন কলেজ পরিচালকমণ্ডলীর সংকীর্ণ মনোভাবকে পরিবর্তিত করতে পারেননি। সকল সময় পরিচালকমণ্ডলী তাঁকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং অবশেষে ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জ্ঞানরঞ্জনের অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই রিপন কলেজে তাঁকে ইংরাজী অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। সত্য বলতে কি, বিদ্যাসাগর কলেজের সহঃ অধ্যক্ষের প্রচ্ছন্ন বিরোধিতার ফলেই জ্ঞানরঞ্জন অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি যখন অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন তখন জ্ঞানরঞ্জন পরম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সাদর অভিনন্দনলিপি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ সহকারে পাঠালেন। এইরূপ মনোভাব বাঙ্গলাদেশে খুব অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। এই বলিষ্ঠ ধৈর্য, ক্ষমা ও প্রেম জ্ঞানরঞ্জনের জীবনকে সর্বদা আলোকিত করত। এইভাবে তিনি পরম শত্রুদের সহিত আচরণ করতেন। এইভাবে জ্ঞানরঞ্জনের সুনাম ছাত্রসমাজে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

প্রতি রবিবারে তিনি নিয়মিত খ্রীষ্টীয় উপাসনায় যোগদান করতেন। সপ্তাহের অন্য দিনগুলি তাঁর গৃহ ছাত্রে পূর্ণ হয়ে থাকত। শুধু যে তাঁর কলেজের ছাত্রেরা শিক্ষা নিতে আসতেন তা' নয়, কিন্তু অন্যান্য কলেজ

থেকেও বহু ছাত্রের সমাগম হ'ত। এতেই তাঁর জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। ছাত্রদের মধ্যে অনেক প্রকারের প্রার্থী ছিল; যেমন, পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ, পার্সেণ্টেজ কমের দরুণ অসুবিধা দূরীকরণ, চাকুরীর জন্য প্রশংসাপত্র, বিশিষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকবার জন্য চিঠি, অর্থসাহায্য লাভের আশা ইত্যাদি। জ্ঞানরঞ্জন সর্বদিক দিয়ে যেসব সুবিধা অর্জ্জন করেছিলেন সেগুলি অম্লান বদনে ছাত্রদের সুবিধার্থে দান করতেন। এতেই ছিল তাঁর আত্মপ্রসাদ। বহু অর্থ উপার্জ্জন করলেও তিনি ছিলেন দীনাতিদীন; কারণ আয়ের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হ'ত গুপ্ত-দান ও সেবায়। বাইরের কেউ আজ পর্যন্ত তাঁর গুপ্তদানের প্রার্থীদের জানেন না। অনেক সময় জ্ঞানরঞ্জন তাঁর আয়ের অধিকাংশ দরিদ্র হিন্দু আত্মীয়দিগকে দিতেন, কখনও বা ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়ার ফি অথবা পুস্তকক্রয়ের জন্য অথবা কলেজ-ফীর দরুণ ব্যয়িত হ'ত। ভারতে শিশু-রক্ষা সমিতির তিনি একজন উদ্যোগী সদস্য ছিলেন। যখনই সক্ষম হতেন তিনি সাধ্যমত দরিদ্রদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করতেন। কয়জন খ্রীষ্টভক্ত নরনারী এভাবে নিজ কষ্টে অর্জিত অর্থ দান করে থাকেন? কাজেই জ্ঞানরঞ্জনের গুপ্ত-দান দেখে তাঁর গুরু খ্রীষ্টের কথা স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতা ডাফ মণ্ডলীর elder ছিলেন। যখনই চার্চের পালক অনুপস্থিত থাকতেন, তখন জ্ঞানরঞ্জন স্বেচ্ছায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ অথবা মাসের পর মাস ইংরাজী ও বাঙ্গলায় উপাসনা চালাতেন, এতে তাঁর কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ ছিল না কিন্তু ছিল আনন্দ। তিনি শুধু ডাফ মণ্ডলীরই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন না, বঙ্গ-দেশের সব খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী তাঁর সেবা ও সাহচর্য পেয়েছিল। সারা খ্রীষ্টীয় সমাজ সর্ব সময়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও সহযোগিতা লাভ করত। তাঁর কাছে Denomination বা মণ্ডলীগত পার্থক্য কিছুই ছিল না, কারণ তিনি ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত মণ্ডলীর আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। খ্রীষ্টকে যারাই মানবের মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করত, তিনি তাদেরই সেবা করতে সদা তৎপর ছিলেন। তিনি বরাবরই বুঝেছিলেন যে মাণ্ডলিক ভেদাভেদ খ্রীষ্টমণ্ডলীগুলিকে পৃথক করে রেখেছে, সেইজন্য মনে প্রাণে তিনি মণ্ডলী-গুলির ঐক্য বা একত্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন।

জ্ঞানরঞ্জন নির্ভীকভাবে প্রচার করতেন এবং প্রচারে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। খ্রীষ্ট যে মানবের একমাত্র মুক্তিদাতা তা' তিনি সর্ব সময়ে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর মুখনিঃসৃত খ্রীষ্টবাণী কখনও বিফল হয়নি। তিনি সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন বিষয়ে স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা দিতে পারতেন। বহু হিন্দু তাঁকে পরম ভক্তি করতেন ও তাঁর খ্রীষ্টীয় জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে ভক্ত জ্ঞানরঞ্জন পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল রত্ন অন্তর্হিত হয় এবং বাঙ্গালী জাতির হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান ও মুস্লীম সকলেই শোকাভিভূত হন। দেশের সর্বত্র শোকের ছায়া পড়ে এবং সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বাঙ্গলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল ক্ষতি হয় জ্ঞানরঞ্জনের তিরোধানে। তাঁর শবাধার হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জনগণ স্কন্ধে করে বয়ে নিয়ে যান। পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় জনগণ সমবেত হন। হাজার হাজার লোক তাঁর মৃত্যুতে মুহ্যমান হন ও শবানুগমন করেন। পার্কসার্কাস স্থিত Scottish Cemetery-তে তাঁর নশ্বর দেহকে সমাহিত করা হয় ও সকলের নয়ন অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত হয়। সর্ববিষয়ে জ্ঞানরঞ্জনের ছিল শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু তিনি সর্ব সময়ে নিজেকে নম্রতায় ঢেকে রাখতেন। যদিও তিনি মাসিক প্রায় ১,৫০০৲ উপায় করতেন তবুও তাঁর জীবন ছিল অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর। সারল্য ছিল তাঁর মূলমন্ত্র, তিনি কখনও নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চাইতেন না; তিনি ছিলেন অহমিকাশূন্য ত্যাগী-পুরুষ। তিনি জীবনে কখনও বিলাসিতা করেননি; কখনও তাঁকে দামী পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে দেখা যায়নি। বিলাসিতা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। কার্লাইলের "Plain living and high thinking" ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

তাঁর গৃহস্থিত লাইব্রেরীতে বিশ্বের বিখ্যাত দার্শনিকদিগের মূল্যবান গ্রন্থাদি রক্ষিত ছিল এবং ইংরাজী, কণ্টিনেণ্টাল, গ্রীক, সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও সাংস্কৃতিক সাহিত্যেও পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর জীবন ছিল অনাড়ম্বর, উৎসর্গী-কৃত ও জ্ঞানপিপাসু; বিভিন্ন মণ্ডলীতে রবিবারে সৌম্য, শান্ত, ভক্তিপূর্ণ

অন্তরে খ্রীষ্টের মহাবাণীর তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত প্রচারক। তাঁর স্থান এপর্যন্ত পূরণ হয়নি। সাহিত্যসভা, ধর্মসভা, শিক্ষার আলোচনা সর্বত্রই তাঁর সুপক্ক জ্ঞান ও ভাবের কথা শুনতে লোকেরা আগ্রহসহকারে আসতেন। জ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্যালোচনা অনর্গল তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতেন ও শ্রোতারা চমৎকৃত হতেন। সর্বস্থানে জ্ঞানরঞ্জন সঠিক সময়ে উপস্থিত হতেন, কখনও কোনো সভাসমিতিতে তাঁর বিলম্ব হ'ত না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি ঘড়ি অথবা wrist-watch নিয়ে কখনও চলাফেরা করতেন না। সম্মতি জানিয়ে কোনো সভায় অনুপস্থিত হওয়া তাঁর রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় যুবক-যুবতীদিগের থিয়েটার ও সিনেমা দেখার বিরোধী ছিলেন। জ্ঞানরঞ্জনের মত ছিল সিনেমা ও থিয়েটার দেখা একটী মন্দ স্বভাব, যদ্দ্বারা সৎ ও সরল মানুষ বিপদে পতিত হতে পারে। সর্বশেষে বলা যায় তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত, একটী ভক্ত ও নিষ্ঠাবান ও প্রেরণাপূর্ণ জীবন যাঁর প্রেরণায় ছাত্র, শিক্ষক ও খ্রীষ্টীয় সমাজ পেয়েছিল নূতন প্রেরণা ও কর্মশক্তি। বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু জ্ঞানরঞ্জনের জ্ঞানালোক সমাজ আজও বিস্মৃত হয়নি। তাঁর জীবনালেখ্য লেখবার সময়ে লেখকের মনে হয় তিনি ছিলেন পবিত্র, সুন্দর ও নির্মল। তাঁর উদ্ভাসিত জীবনের আলোকচ্ছটায় খ্রীষ্টীয় সমাজ ও ন-খ্রীষ্টীয় জনগণ চিরকাল প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করবে। সে আলোক ম্লান হবার নয়—তা প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টের প্রতি তব অনুরাগ বর্দ্ধিত হ'ল যবে,
কৃষ্ণমোহন, খ্রীষ্ট-স্মরণ লইলে যে তুমি তবে।
যা' ছিল তোমার জ্ঞানভাণ্ডারে,
খ্রীষ্ট-চরণে দিলে তুমি তারে,
সমাজের বুকে গৌরব-টিকা চিরকাল আঁকা রবে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ডাঃ এলেক্সাণ্ডার ডাফের সংস্পর্শে সর্বপ্রথম এলেন, তখন সকল ধর্মের সত্যাসত্য-সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা সভাগুলি এবং অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি ক্রমশঃ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'তে লাগলেন। অবশেষে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন মহাপ্রভু খ্রীষ্টের ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তাঁর জীবনে সেদিন এল নবপ্রভাত। সেই সময়ে দেশে বহু ধর্ম-অনুসন্ধিৎসু ন-খ্রীষ্টীয় যুবক ধর্মের আলোচনায় যোগ দিতেন এবং অনেকে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতেন। প্রত্যেক যুবকের মনে তখন প্রতি ধর্মটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার প্রবৃত্তি হ'ত। কৃষ্ণমোহন এবং আরো কয়েকজন ভক্ত অসীম সাহসিকতার সহিত বৈপ্লবিক খ্রীষ্টধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এককথায় এই ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি যতই বুঝতে লাগলেন ততই তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হল।

কি ভাবে খ্রীষ্টধর্মের তথ্য ও পবিত্র আত্মার শক্তি এই ভক্তের মনে কার্য-করী হয় তা' নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি থেকেই সুষ্ঠুভাবে প্রতীয়মান হবে :

"পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বর আমার হৃদয়ের অর্গল খুলে দেন ; পাপ, দোষ, ত্রুটী তখন স্পষ্টই বোঝা যেতো এবং মহাপরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ে অনুভূত হ'ত। পাপ থেকে পরিত্রাণ অথবা মুক্তি এক মুক্তিদাতার মহামৃত্যুতে সম্ভবপর হয়েছিল। এই একমাত্র পরিত্রাণতত্ত্বই ছিল আমার তর্কের মূলবস্তু এবং এই পরিত্রাণতত্ত্ব আমার অবশেষে বাইবেল শাস্ত্রের বাক্যের প্রতি এনেছিল বিশ্বাস, ভক্তি ও বিজ্ঞতার নিদর্শন।" তৎপরে

আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণমোহন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অবস্থিত সি. এম. এস হাইস্কুলের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থাকেন।

অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অনেক জ্ঞানপিপাসু সেই সময়ে কৃষ্ণমোহনের নিকটে ধর্মের ব্যাখ্যা ও শিক্ষার জন্য আনাগোনা করতেন। এই ধর্ম-আলোচনায় তিনি পেতেন প্রচুর আনন্দ ও শান্তি। সেই সুযোগে খ্রীষ্টের এই দাস খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করেন ও তুলনামূলকভাবে ভারতের অন্যান্য ধর্মগুলি এবং তার দার্শনিক মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হন। ভবিষ্যৎ জীবনে এইসব দার্শনিক তত্ত্ব ও তুলনামূলক আলোচনার বিষয়গুলি তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে স্বনামধন্য হন।

১৮৩৯-৫১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন ক্রাইষ্ট চার্চ মণ্ডলীর পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেই সুযোগে খ্রীষ্টধর্মের অমর ও অতুলনীয় তত্ত্বগুলি জনগণের মধ্যে প্রচারের সুবিধা ও সুযোগ লাভ করেন। মাদ্রাজের বিশপ আর্চ ডিকন ডিলট্রী (Dealtry) ক্রমশঃ কৃষ্ণমোহনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হ'য়ে উঠেছিলেন। এর প্রধান কারণ ছিল কৃষ্ণমোহনের খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও আগ্রহ। কৃষ্ণমোহনের পৌরোহিত্য গ্রহণ করবার পরে ক্রাইষ্ট চার্চে প্রায় ছয়শত লোকের সমাগম হয়েছিল। তাঁর বাণী ও উপদেশ জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া এনেছিল। এই সময়ে আর্চ ডিকন ডিলট্রীর সমভিব্যাহারে কৃষ্ণমোহন কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) জনসমাবেশে প্রায় ৩,০০০ ব্যক্তির সমক্ষে খ্রীষ্টধর্মের প্রেমের আদর্শসম্পর্কে সুললিত উপদেশ প্রদান করেছিলেন। ক্রাইষ্ট চার্চের তাঁর উপদেশামৃত একটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই গ্রন্থটি সর্বজনসমাদৃত হয়। এই গ্রন্থখানিকে ন-খ্রীষ্টীয় জনগণ মনোনিবেশসহকারে সমাদরের সহিত পাঠ করেন।

১৮৫১-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাওড়া বোট্যানিকেল উদ্যানের নিকটস্থ বিশপস্ কলেজে কৃষ্ণমোহন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে এইরূপ সম্মান কোনো বাঙ্গালী পান নাই। কৃষ্ণমোহনের নিয়োগে তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টীয় পুরোহিতবৃন্দের মুখোজ্জ্বল করেন, কারণ ব্রিটিশ আমলে ইউরোপীয় অধ্যাপক অথবা অধ্যক্ষেরা খুব বিবেচনাপূর্বক খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতেন। সুতরাং কৃষ্ণ-মোহনের এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী পুরোহিতের যথেষ্ট সুনাম বৃদ্ধি পায়।

এই যোগ্যব্যক্তি নির্বাচনে যে দায়িত্বভার তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছিল, তাকে সুনির্বাচন বলা যায়। প্রায় শতাধিক বৎসর ধরে বিশপস্ কলেজের ধর্ম-ভাবাপন্ন অধ্যাপকমণ্ডলী খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ যত্নসহকারে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছিলেন।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেথুন সোসাইটির একজন কৃতী সভ্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন। সেখানে নানারূপ আলোচনা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নত চর্চা হ'ত। সেখানে নানাবিধ আলোচনা-তর্ক হ'ত এবং কৃষ্ণমোহন তাঁদের মধ্যে একজন যোগ্য বক্তা ছিলেন।

ইংলণ্ডের 'বিখ্যাত সমাজসেবী মিসেস্ মেরী কারপেণ্টার যখন নারী-শিক্ষার অগ্রগতির পরিকল্পনা করতে ভারতে আগমন করেন, তখন কৃষ্ণমোহনের সংস্পর্শে এসে তিনি বিমুগ্ধ হন। ভারত-পরিদর্শনের সেই বর্ণনায় তিনি বার বার কৃষ্ণমোহনের গুণপনার কথা উল্লেখ করেছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারহিসাবে ও কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যহিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। সিনেটের বিশিষ্ট সদস্যহিসাবে কৃষ্ণমোহন হিসাব-পত্র, পরিচালনা এবং অর্থনীতির দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করেন। ডাঃ ডাফের সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ-মোহন বিশ্ববিদ্যালয়-সংগঠনের কাজে সুনাম অর্জন করেন। ডাঃ ডাফের প্রধানতম উদ্যোগে physical science-এর শিক্ষা এবং তার বিশেষ অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ব্যানার্জীর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ অবদানের জন্য তাঁকে LL.D. উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

Education Commission-এ যখন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Sir W. W. Hunter বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন ডাঃ ব্যানার্জীর সাক্ষ্যকে মূল্যবান বলে গ্রহণ করা হয়। কৃষ্ণমোহনের বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকায় ঐ কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় তাঁকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয়। তিনি উচ্চশিক্ষাকে স্বাবলম্বী করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তদানীন্তন মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিট্যুশানে, সিটি কলেজে এবং মিশনারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, ব্যয়সাধ্য সরকারী প্রচেষ্টা সমীচীন হবে না। ভারতীয়করণের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে

কৃষ্ণমোহন দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে ইতিহাস, সাহিত্য ও অঙ্কের অধ্যাপক পদের জন্য বিদেশ থেকে উচ্চমাহিনায় উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপকমণ্ডলী আনবার কোনো প্রয়োজন নাই। জাতীয়তার দিনে দেশবাসীগণ কৃষ্ণমোহনের এই স্বাধীন মতবাদকে যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। নিরীশ্বরবাদী অধ্যাপক নিয়োগের বিরুদ্ধে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। নিরীশ্বরবাদী অধ্যাপকসম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে এইরূপ নিয়োগে ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে এবং ধর্মপ্রাণ দেশে ছাত্রদের মনে বিশৃঙ্খলতাও আসতে পারে। ঐ Education Commission-এর একজন বিশিষ্ট সভ্য বলেছিলেন যে ডাঃ ব্যানার্জী এমনি একজন বাঙ্গালী শিক্ষাবিদ্, যিনি অন্যান্য সাক্ষীদিগের অপেক্ষা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বিষয় উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর একমাত্র কারণ ছিল তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। কৃষ্ণমোহন *Enquirer* নামক উদার মতাবলম্বী সাময়িক পত্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। সেই প্রভাব ক্রমশঃ খ্রীষ্টীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হ'তে লাগল। এর পরে *Calcutta Review* নামক পত্রিকার সহিত সংযুক্ত থেকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। পত্রিকাটীর সম্পাদন করেন ডাঃ ডাফ ও স্যার জন. কে। ডাঃ ব্যানার্জীর লেখা-সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, সেগুলির অপরূপ মূল্য ছিল কারণ সেগুলির পরিবেশন ছিল স্বচ্ছ সুন্দর ও ষ্টাইলে অনিন্দনীয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার *Dialogues on the Hindu Philosophy* নামক পুস্তকটী ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকটী সুধীসমাজে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইহার পরে তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৬২ ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কালিদাশের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্য সম্পাদন করেন।

বাংলা ভাষায় তিনি গীতসংহিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন ইংরাজী ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি বাঙ্গালী খ্রীষ্ট-সমাজের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি সূচনা করেন। তাঁর সাধারণ বক্তৃতাংশ, উপদেশ সাহিত্য ও সাংবাদিক প্রবন্ধগুলির সংগ্রহকে এক বিরাট গ্রন্থমালায় পরিণত করা যায়, কিন্তু এপর্যন্ত তার কোন প্রচেষ্টা হয়নি। স্বাধীন ভারতে এই প্রচেষ্টা কি করা যায় না ?

খ্রীষ্টিয় সমাজ

ডাঃ ব্যানার্জী ছিলেন তৎকালীন খ্রীষ্টীয় সমাজের একচ্ছত্র নেতা ও সমাজসেবক। তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘ বা Indian Christian Association-এর প্রথম সভাপতি-পদ অলংকৃত করেন। সারা বাঙ্গলা দেশে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্ট-আদর্শ প্রচার করেন ও খ্রীষ্ট-সমাজের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত করতে সহায়তা করেন। ভবিষ্যৎ দিনে ক্রমশঃ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে তিনি সমাজকে সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ধাপে নিয়ে যান। খ্রীষ্টীয় সমাজকে স্বাবলম্বনের পথ কৃষ্ণমোহন দেখিয়েছিলেন। জাতীয়তার দিনে রব উঠেছিল জাতীয়করণ, স্বাবলম্বন। মণ্ডলীকে কিভাবে জাতীয়-করণ করা যায় তা' চিন্তা করছিলেন কৃষ্ণমোহন। একটী কেন্দ্রীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করে যাতে ভারতীয় পুরোহিতবর্গকে নিযুক্ত করা যায় জাতীয় অর্থে সেই সম্পর্কে সকলে চিন্তান্বিত ছিলেন। ডাঃ ব্যানার্জীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই মনোভাব তীব্রতর হতে লাগল কিন্তু কয়েকজন বিদেশী মিশনারী আন্দোলনের ভুল অর্থ করে মনে করলেন, জাতীয়তার আন্দোলনে বিদেশী ও ভারতীয় মণ্ডলী তদ্দ্বারা পৃথক হ'য়ে পড়বেন ; বিদেশী ভ্রাতৃবৃন্দের যুক্তির অসারতা কৃষ্ণমোহন তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। শিক্ষিত খ্রীষ্ট-সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ডাঃ ব্যানার্জীর অতুলনীয় নেতৃত্বে কখনও বিদেশী ও ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ পৃথক হয়ে পড়বেন না কিন্তু সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত উন্নতি ও ঐক্য সূচিত হবে। কৃষ্ণমোহন কলিকাতা মিশনারী কন্‌ফারেন্সের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং বিশপ তাঁকে অবৈতনিক চ্যাপলেন (Chaplain) পদে মনোনীত করেছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের পরেই ডাঃ ব্যানার্জীর অসামান্য অবদান বাঙ্গলাদেশের খ্রীষ্টীয় সমাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে সব সময়ে ছিল সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও খ্রীষ্টের আদর্শস্থাপন। ইদানীং কৃষ্ণমোহনের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন সেরূপ প্রতিভাশালী নেতা কোথায় ?

শেষ

ডাঃ ব্যানার্জী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অবশেষে ১১ই মে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনলীলা শেষ হয়। দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীকে

তিনি নানা অবদান দিয়ে গিয়েছেন এবং তা' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমে তাঁর ধর্ম ও সমাজ-জীবনে যে অনিশ্চয়তা ও বন্ধন ছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে সে শৃঙ্খল মুক্ত হয়। তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা ছিল এবং তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী পুরুষ। তাঁর দেশপ্রেম ও নির্ভীকতা বলিষ্ঠ ধরণের ছিল ও দেশবাসীরা তাঁকে দেশপ্রেমিক বলে জানতেন।

একথা সত্য যে কৃষ্ণমোহনের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে তিনি বাঙ্গালাদেশে খ্রীষ্ট-সমাজের স্থায়ী স্থান করে যান। আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুসন্ধানী, সত্যের সন্ধানী ও আলোকের সন্ধানী কৃষ্ণমোহন নির্ভীকহৃদয়ে খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করে বৈপ্লবিক মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। ডাঃ ব্যানার্জীর মনের শান্তি ও ক্ষুধা খ্রীষ্টধর্ম মেটাতে সক্ষম হয়েছিল, এধর্মের গ্রহণ তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কৃষ্ণমোহনের ন্যায় জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী পুরুষ বাস্তবিকই খ্রীষ্ট-সমাজের আলোক-স্তম্ভের মত। সেই সময়ে যোগ্যতার অভাব মনে করে বিদেশী ভ্রাতৃবৃন্দ পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভারতীয় খ্রীষ্টীয় পুরোহিতের উপরে ন্যস্ত করতেন না, তাঁরা মনে করতেন যে ভারতীয়গণ ঠিক উপযুক্ত হননি। কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জীর অসামান্য প্রতিভা, নেতৃত্ব ও গুণপনা সে সংশয় দূর করে। সাহিত্যবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাদি দেশের উচ্চতম সাহিত্যের নিদর্শনস্বরূপ পরিগণিত হয়েছিল। বাস্তবিক তাঁর লেখা জাতীয় সাহিত্যকে করে পরিপুষ্ট সাধন ও আনে নূতন আলোকসম্পাত। তাঁর প্রবন্ধাদি অধ্যয়ন করে দেশের জ্ঞানী-গুণীজন অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতেন সুতরাং কৃষ্ণমোহনের অবদানকে জাতীয় অবদান বলা যেতে পারে। কৃষ্ণমোহনের অপূর্ব খ্রীষ্টীয় জীবন অনুকরণের যোগ্য। সেই সুন্দর খ্রীষ্টীয় জীবনে যেন জাতীয়ভাব বিমণ্ডিত ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সম্মিলন করবার তাঁর ক্ষমতা ছিল, কৃষ্ণমোহন সংকীর্ণ-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। খ্রীষ্ট-ধর্মের উদার আলোকে ও আদর্শে গঠিত ছিল তাঁর জীবন সুতরাং পাশ্চাত্যের হিতকর বিষয়গুলির সহিত প্রাচ্যভাবের হিতকর বিষয়গুলির সম্মিলন তিনি করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকের সহিত মেলামেশা তিনি করতেন ও তা থেকে উচ্চাঙ্গের ভাবের আদান-প্রদান হ'ত। খ্রীষ্টীয়

সমাজে তিনি নবজীবনের ও ধারার সঞ্চার করেন। ভিন্নধর্মী হলেও কৃষ্ণমোহনের জ্ঞানপূর্ণ যুক্তি-তর্ক জনগণের মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল। এককথায় কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হলেও তাঁর অসামান্য প্রতিভা দেশবাসীরা স্বীকার করেছিলেন। বিদেশী মিশনারীরা তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য স্বীকার করেন কিন্তু তাঁর তীব্র জাতীয়তাবাদকে ভুল বুঝেছিলেন, কৃষ্ণমোহন জাতীয় মণ্ডলী গঠন করতে চেয়েছিলেন ভারতীয়দের দ্বারা, ভারতীয় অর্থে কিন্তু তাঁর যুক্তির মধ্যে বিদেশীদের প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণা বা দ্বেষ ছিল না। প্রাচ্য ভাবধারার সহিত পাশ্চাত্যের মধুর সংমিশ্রণ তিনি করেছিলেন। একথাও ঠিক যে কৃষ্ণমোহন বিদেশীদের ভারতীয় অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন মনে করতেন না; তিনি উভয়কেই সমপর্যায়ে দেখতেন। জাতীয় মণ্ডলীগঠনের পরিকল্পনা ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন, কিন্তু তা গঠন তখন সম্ভবপর হয়নি। বঙ্গদেশের যুবক-যুবতীরা কি মণ্ডলীর ঐক্যবদ্ধ জাতীয়করণের পূণ্য কাজে সহায়তা করবেন না? কৃষ্ণমোহনের মত দৃপ্ত, বলিষ্ঠ খ্রীষ্টীয় নেতা আবার কবে সমাজ-জীবনে আবির্ভূত হবেন? কৃষ্ণমোহনের ন্যায় সুসন্তানের জন্ম ও মৃত্যু দিবসকে পালন করে সমাজ কি তাঁর স্বপ্নকে স্বার্থক করবেন না? সমাজের এও এক মহান কর্তব্য।

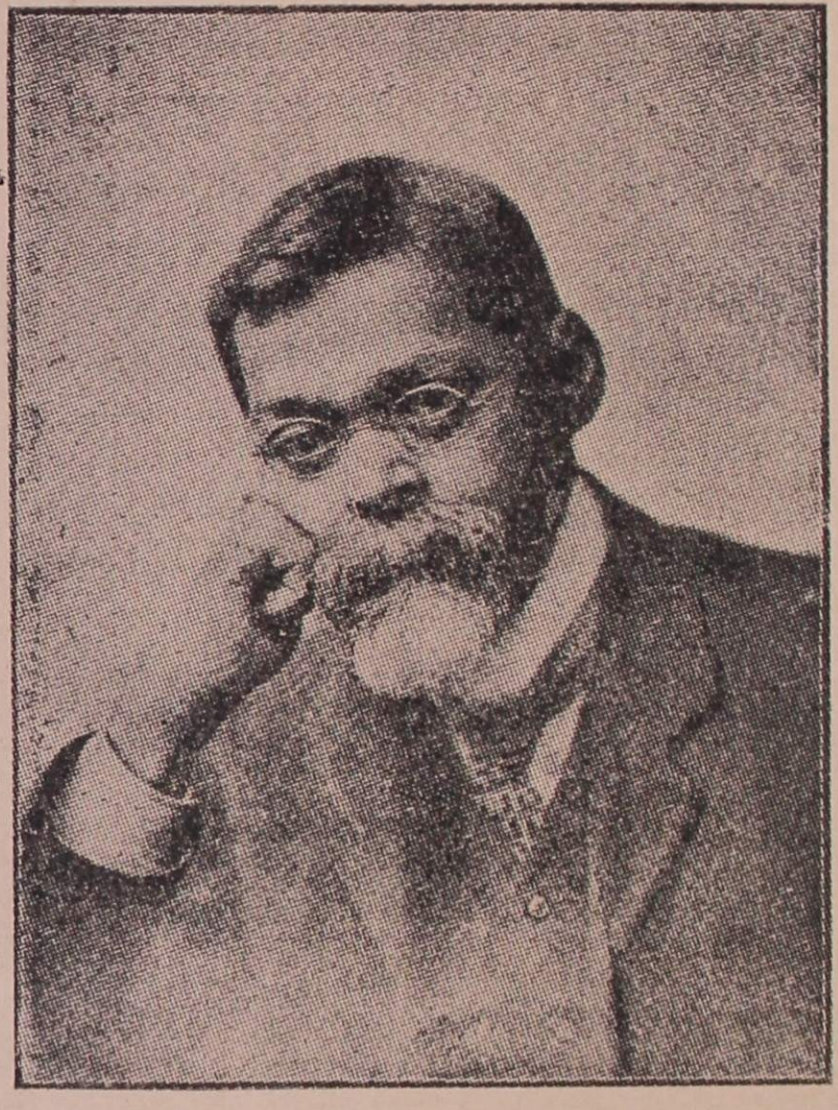

সুশীলকুমার রুদ্র

সুশীলকুমার রুদ্র

নীরব-কর্মী সুশীলকুমার
তব অবদান কত,
দেশেরে তুমি যে ভালবেসেছিলে
আপন প্রাণের মত।
প্রার্থনাশীল তোমার জীবনে,
কিছুই করনি খ্রীষ্ট বিহনে;
ভালবাসা, প্রেম লাভ করেছিল কত যে ভাগ্যহত।

বর্তমান ভারতের ক্রমবর্ধমান অবস্থায় রাজনীতি-চর্চা প্রাধান্য লাভ করেছে, এ সময়ে আধ্যাত্মিক কোনো বিষয়ের অবতারণা করলে তা অনেকের নিঃপূত হবে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক বা সমাজ সেবা বা শিক্ষায় বিশেষ অবদান থাকলেও দেশে তার তত সমাদর নাই। অধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্রের মহান জীবনে তাঁর মাহাত্ম্যে ও নীরব-দেশসেবায় মুগ্ধ হই। মহাত্মা গান্ধী তাই তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন "নীরব কর্মী"।

অধ্যক্ষ রুদ্র ছিলেন একজন শান্ত ও নীরব দেশপ্রেমিক। ভারতে তাঁর মত দেশসেবক ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি মেলে না। শুধুমাত্র যাঁরা তাঁর সাথে গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন, তাঁরাই সুশীল-কুমারের গভীর স্বদেশপ্রেম, প্রার্থনার নীরব জীবন, প্রগতিমূলক কাজে উৎসাহ ও উচচাঙ্গের বুদ্ধি-প্রখরতার কথা জানতেন। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য ও মানবতা ছিল অপরিসীম। দেশ যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত ছিল সে সময়ে সুশীলকুমার খ্রীষ্টের প্রেমময় শান্তির বাণী নিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন হিন্দু-মুস্লীমের মধ্যে। দাঙ্গাকারী বিক্ষুব্ধ জনগণ তখন এক নূতন ফুলের আঘ্রাণ পেয়েছিল সুশীলকুমারের কাছে। সে ফুল প্রেমময় খ্রীষ্টের প্রেমে রঞ্জিত বিশেষপুষ্প। হাকিম আজমল খাঁয়ের মত মহান দেশপ্রেম, সাম্প্রদায়িকদোষমুক্ত মনোভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মহাত্মা গান্ধী ও রেভাঃ দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন—"১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাড়ী ফেরবার পরে আমি সব সময়ে সুশীলকুমারের দিল্লীস্থ গৃহে অতিথি হতাম। Rowlatt Act-এর জন্য যতদিন পর্যন্ত আমি আন্দোলন না করেছিলাম ততদিন পর্যন্ত সবই ভালো ছিল। ধনী-মহলে ও শিক্ষিত-মহলে তাঁর অনেক ইংরাজ-বন্ধু ছিলেন। দিল্লীর St. Stephen's College-এ তিনিই প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমি তাই চিন্তা করে-ছিলাম যে আমি তাঁকে (সুশীলকুমারকে) কোনো রকমে বিব্রত করছি নাতো। সেইজন্য অন্যত্র বসবাসের প্রস্তাব নিয়ে গেলাম। অধ্যক্ষ রুদ্রের স্পষ্ট উত্তর এসেছিল—'আমার ধর্মবিশ্বাস অনেক গভীর; আমার কতকগুলি মতামত আমার জীবন-মরণের প্রশ্নের মত। সেগুলি হ'ল সুদীর্ঘ প্রার্থনার ফলবিশেষ। এই মতামতগুলি আমার প্রিয় ইংরাজ-বন্ধুগণ ভালো-ভাবেই জানেন। আপনাকে আমার আশ্রয়ে রেখে আমি কাউকে ভুল বোঝাতে চাই না। যদি কখনও আমাকে আপনার বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও ইংরাজের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো পথ বেছে নিতে হয়, তবে আমি ভালভাবে জানি আমি কোনটি বেছে নেব। আপনি আমাকে কখনও ছাড়তে পারবেন না।'"

মহাত্মাজী জানালেন, কিন্তু আমি তো ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি; তাঁরা তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনার বাড়ীকে নিশ্চয়ই আপনি একটী সরাইখানায় পরিণত করতে চাইবেন না। এই কথায় সুশীলকুমার বলেছিলেন—"আমি এসবই ভালবাসি। আমি আপনাকে নিজ গৃহে রাখলে শান্তি এই যে, আমি দেশের প্রতি কিছুটা কর্তব্য সাধন করছি। আপনাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।" Khilafat দাবী ও আন্দোলনসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী লাট সাহেবের নিকটে যে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন, তাও রুদ্রের গৃহে লিখিত হয়েছিল। রুদ্র ও চার্লি (এণ্ড্রুজ সাহেব) গান্ধীজীর প্রস্তাবের সংশোধন করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করা হ'ল রুদ্রের গৃহে। সেই মুশ্লীম-সম্মিলনের একমাত্র নীরব-দর্শক ছিলেন সুশীলকুমার। সেই দেশপ্রেমিক খ্রীষ্টীয়ানের স্বাদেশিকতা প্রমাণিত হবে—নিম্নলিখিত বিবরণী থেকে:

ভারতবন্ধু মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজ বলেন—সুশীল আমার বহুপুরাতন, বিশ্বস্ত ও প্রিয়তম ভারতীয় বন্ধু। জগতে তাঁর কাছে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। সুশীলই আমাকে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। জীবনের প্রথম দিকের কঠিন ও সমস্যামূলক দিনগুলি তিনি আমাকে সযত্নে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করেছিলেন। সুশীলকুমার না থাকলে হয়তো আমি জীবনে অন্য পথে বা ভুল পথে চালিত হতাম। বেসিল ওয়েষ্টকট আমার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আমরা দুইজনে একসঙ্গে কেম্ব্রিজ-মিশনে এলাম। তবে বেসিল প্রথমে এসেছিলেন। বেসিল প্রায়ই আমাকে সুশীলের কথা লিখতেন এবং শেষে তিনি (সুশীল) আমার প্রধান দার্শনিক ও প্রিয়তম বন্ধু হলেন। যে কয়দিন আমি দিল্লীতে ছিলাম রুদ্র আমার অন্তরঙ্গহিসাবেই ছিলেন। এই গভীর প্রেম-ভালবাসা কখনও ক্ষীণ হয়নি। সুশীলকুমার প্রথম-সাক্ষাতেই আমাকে বলেছিলেন যে আমার বাড়ী হ'ল তাঁর বাড়ী। তাঁর ছেলেমেয়ে আমারি ছেলেমেয়ে। হঠাৎ সুশীলকুমারের স্ত্রীবিয়োগে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। এইভাবে শোকাচ্ছন্ন হওয়ায় তাঁর তিনটি ছেলেকে দেখা-শোনা করতে হয় ও তৎসঙ্গে কলেজের কাজও চালিয়ে যেতে হয়। সেই সময় সুশীলকুমার মিঃ বেসিলের পরম সান্নিধ্যে এসে দুঃখ-কষ্টকে জয় করতে পেরেছিলেন। আমাদের মধ্যে জাতি-ধর্মের কোনো পার্থক্য ছিল না। সুশীলকুমার আগন্তুকের সঙ্গে প্রথমে সাবধানে অল্প কথা বলতেন, আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কিন্তু একদিনে একমুহূর্তেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রশ্ন উঠল যে সুশীলকুমারকে কলেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করা হবে কি-না। ইংরাজ-অধ্যক্ষ নিয়োগের কথাও চলছিল। প্রথমে আমার নাম ও Mr. Western-এর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা সে প্রস্তাবে সম্মত হই নাই, কারণ সুশীলকুমার ছিলেন আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ। Lahore-এর মান্যবর বিশপ-মহোদয় এই নিয়োগে বিশেষ প্রীত ছিলেন না এবং সেইজন্য সহজে সম্মত হচ্ছিলেন না। এত বড় কলেজের গুরুভার ও পূর্ণ দায়িত্ব সুশীলকুমারকে কিভাবে দেওয়া যায়? বিশপ-মহোদয় মনে করেছিলেন যে অনেক অভিভাবক হয়তো সেই অনুমোদন গ্রহণ করবেন না আর দ্বিতীয়তঃ কোনো

গুরুতর পরিস্থিতি ঘটলে তিনি অবস্থা যদি আয়ত্তে না আনতে পারেন। অবশেষে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর রুদ্রকেই অধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত করা হয়। এতে বোঝা যায় যে সুশীলকুমারের যথেষ্ট দক্ষতা ও জ্ঞান ও জনপ্রিয়তা ছিল। সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর ধরে দিল্লীর St. Stephen's College-এ সুশীলকুমার যোগ্যতার সহিত অধ্যক্ষতা করেন। তাঁর অধীনে কলেজের অনেক উন্নতি হয় ও সুন্দরভাবে চালিত হয়। সুশীলকুমারকে ছাত্রদের অভিভাবকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন। তাঁর অসীম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কলেজে যখন কোনো বিপদ উপস্থিত হ'ত তখন রুদ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলতা, ধীরতা ও প্রার্থনাশীল জীবনের সাধনার দ্বারা সমস্যাটি ত্বরায় সমাধান করতেন। এটীকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলা যায়। সুশীলকুমারের সুনাম ভারত ও ইংলণ্ডে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দক্ষতার সহিত ইউরোপীয় ও ভারতীয় মিশনারী অধ্যাপকদের উপরে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা-সহকারে কর্তব্য পালন করেছিলেন—এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। Mr. Gokhale যখন Royal Commission-এ এসেছিলেন তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কিভাবে তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েটদের সুষ্ঠুভাবে ও সন্তোষজনকভাবে কলেজের কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। রয়্যাল কমিশনের সমক্ষে এই সাক্ষ্যের ফল সুদূরপ্রসারী হয় এবং ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ-সরকার উভয়েই ইহার দ্বারা উপকৃত হ'ন। নিঃস্বার্থ-পরতা ছিল সুশীলকুমারের শ্রেষ্ঠগুণ এবং এটী তিনি অর্জন করেন জীবনের অধীশ্বর খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে। নিজ জীবনে তিনি খ্রীষ্টের শিক্ষাকে প্রতিফলিত করতেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন নম্রতা ও ধীরতার প্রতীক। তাঁর নম্রতা ও খ্রীষ্টভক্তি দেখে লোকে চমকৃত হতেন। প্রভু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সব কাজের প্রারম্ভে বা মূলে সুশীলকুমার খ্রীষ্টকে সর্বাগ্রে রাখতেন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তিনি খ্রীষ্টের নিকটে প্রার্থনার পরে দিতেন। কাজেই তাঁর জীবনে আশ্চর্য একটী আধ্যাত্মিকতা গড়ে উঠেছিল যা' সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। প্রতিপদক্ষেপে তাঁর খ্রীষ্টকে প্রয়োজন ছিল। এই ভক্তিবিশ্বাস একদিনে বা সহসা আসেনি, এসেছিল গভীর বিশ্বাস ও সাধনায়। কলিকাতায় থাকাকালীন তিনি Oxford Mission-এর ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত খ্রীষ্টের অধিকতর সান্নিধ্য লাভ

করলেন। তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য ও নানা সমস্যার জন্য Oxford Mission-এর ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে থেকে ধ্যান-ধারণায় সমাধান করেন। মানসিক যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরে সুশীলকুমার আবার হৃত বিশ্বাসভক্তি ফিরে পেলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ে তাঁর অধিক-পরিমাণ পরীক্ষা এসেছিল। অন্যধর্মীয় লোকদের তিনি কখনও ঘৃণা করতেন না। সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন—ইহাই মহৎলোকের বিশেষ গুণ।

কলেজের চাকর ও মেথরদিগের সাথে তিনি বন্ধুর মত প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করতেন এই দেখে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ পর্যন্ত নিজ ব্যবহারের কথা চিন্তা করে লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে কেউ উচচনীচ ছিল না, এই ছিল তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস। কলেজের অনুষ্ঠানে সুশীলকুমার সকলের সাথে চাকর ও মেথরদিগকেও আমন্ত্রণ জানাতেন। রুদ্রের অসুখের সময়ে একজন বৃদ্ধ ভৃত্য এসে তাঁর খোঁজখবর নেয় ও ঠিকানাও জানতে চায়। সে এসে বলে যে বড় সাহেবের অসুখের কথা শুনে সে কলেজ থেকে ছুটী নিয়ে এসেছে তাঁর শয্যাপাশে থেকে তাঁর সেবা করতে। সে শুনেছিল যে চিকিৎসক সুশীলকুমারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন লেবু খেতে, তাই ভৃত্যটি এক ঝুড়ি লেবু নিয়ে গিয়েছিল। দিল্লীর হিন্দু ও মুশ্লীম জনগণ তাঁকে পরম আপনজন বলে মনে করতেন। তাঁর অতিথিদের মধ্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একজন প্রিয় অতিথি ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সুশীলকুমারের গৃহকে নিজ গৃহ বলে মনে করতেন। হাকিম আজমল খাঁ তাঁর গৃহের একজন বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সুশীলকুমারের অসীম ভক্তিবিশ্বাস ছিল বলে তিনি তাঁর কাছে নিয়ত আসতেন। নূতন নিয়মের শিক্ষায় কিভাবে জীবন পূর্ণতর ও সার্থক করা যায় সে বিশ্বাস ও আশা তাঁর ছিল। পূর্ণ জীবন বলতে কি বোঝায় এই প্রশ্নের উত্তরে রুদ্র বলেছিলেন পার্বতীয় উপদেশই হল পূর্ণতম জীবনের আদর্শ ও মানবের মানদণ্ড। মানবের ইতিহাসে তিনি যীশু খ্রীষ্টের জীবনকেই পরিপূর্ণ ও সার্থক বলে মনে করতেন। তাঁর অধ্যক্ষতার সময়ে অনেক শিক্ষিত ইংরাজ কলেজে শিক্ষালাভ করতে এসেছিলেন এবং তাঁরা সেই আদর্শ জীবনে আকৃষ্ট হয়ে অধিকতর বিনয়ী ও নম্র হয়ে উঠেছিলেন। মহাপ্রভু খ্রীষ্টের জীবনালেখ্য সুশীলকুমারের নিকটে জীবন প্রদীপের মত

ছিল ও সেই আদর্শে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল। মিঃ জে. কে. হইল্যাণ্ড কলেজে অতিথি হয়ে আগমন করে তাঁর ব্যবহারে যার-পর-নাই মুগ্ধ হন। পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট ছিলেন তাঁর কাছে জীবনাদর্শ। জীবন্ত খ্রীষ্টকেই তিনি পরমারাধ্য বলে মনে করতেন। মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই জ্বলন্ত বিশ্বাস তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ এণ্ড্রুজের মধ্যে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি ও মিলনকারী সূত্র। গান্ধাজী তাই বলেন যে সুশীলকুমার হিন্দুধর্ম ও ইস্‌লামের মধ্যে এক সেতুর মত, প্রেম-সহিষ্ণুতায় সমৃদ্ধ।

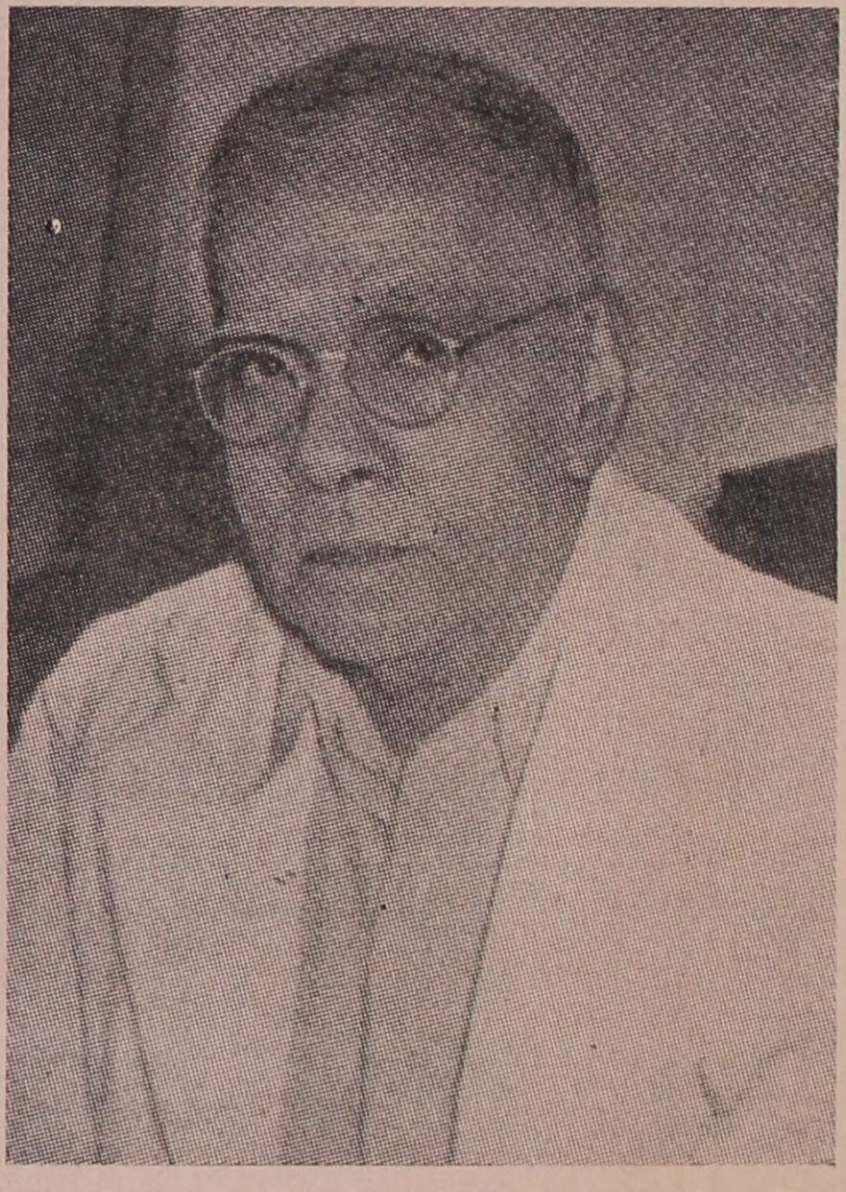

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

SERAMPORE COLLEGE LIBRARY

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

উদার তোমার দৃষ্টিভঙ্গী
দুখীর বন্ধু তুমি,
তব মৃত্যুতে তাই দেশবাসী
চরণ লইল নমি।
হিন্দু ও মুশ্লীম জনগণে,
সেবা করে গেলে দেশ-কল্যাণে ;
প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত তুমি
ভরিলে বঙ্গভূমি।
সকলি দানিলে সঞ্চিত ধনে,
রুগ্ন, আর্ত দীনজনগণে ;
খ্রীষ্টের প্রেম বিতরিলে তুমি
শত্রুরে গেলে ক্ষমি।

স্বনামধন্য হরেন্দ্রকুমার ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ৩রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি রিপন স্কুলে অধ্যয়ন করতেন এবং ১৬ বৎসর বয়সে সুনামের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। শৈশবে তাঁর খেলা-ধূলায় খুব উৎসাহ ছিল এবং basketball তাঁর প্রিয় খেলা ছিল। ঐ রিপন কলেজ থেকে এফ্. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বয়সে বাড়তে বাড়তে হরেন্দ্রকুমার বিখ্যাত পুস্তকব্যবসায়ী এস্. সি. আচ্যের পুস্তকবিপণি থেকে পয়সা বাঁচিয়ে বিখ্যাত ইংরাজলেখকদের বই নিয়মিত কিনতেন। কিন্তু এই সমস্ত বিখ্যাত পুস্তক পড়বার তাঁর সময় কোথায়? অবশেষে রাত জেগে তিনি পড়াশোনা করতে লাগলেন। এইভাবে বিভিন্ন ইংরাজী বইয়ের অনুধাবনে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের পরম অনুরাগী হয়ে ওঠেন। হরেন্দ্রকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ ক্লাশে ভর্তি হলেন ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে। অদম্য উৎসাহ নিয়ে পড়াশোনা চলেছিল কিন্তু সহসা তাঁর মা মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। হরেন্দ্রকুমার মুশড়ে পড়লেন এই শোক ও

বেদনায়। অনার্স ছেড়ে তিনি পাশ কোর্সে বি-এ পাশ করলেন। তার পরে তিনি এম-এ ক্লাশে ভর্তি হলেন। হরেন্দ্রকুমার পূর্বেই এম-এ ক্লাশের অনেক বই পড়ে রেখেছিলেন কাজেই সেই পড়াশোনা তাঁর বেশ কাজে লাগল। এম-এ ক্লাশে অনেক কৃতী, মেধাবী ছাত্র তাঁর সহপাঠী হলেন। তাঁরা অনার্সে ভাল ফল দেখিয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে পর দেখা গেল যে হরেন্দ্রকুমার প্রথম শ্রেণীতে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এই অপূর্ব কৃতিত্বে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। অনেক মেধাবী ও গুণী ছাত্রদের অতিক্রম করে হরেন্দ্রকুমার স্বীয় পরিশ্রমের ফল পেলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক স্বনামধন্য শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয় চৌধুরী।

ছাত্রজীবনের সমাপনে হরেন্দ্রকুমারকে সাংসারিক চিন্তা ও অর্থোপার্জনের বিষয় চিন্তিত করে তুলেছিল। পরীক্ষায় সুফলের জন্য তাঁর সামনে জীবনের অনেক পথ খুলে গেল। সে সময়ে কৃতী ছাত্রেরা অনেক সময়ে ভাল চাকুরী ও সুযোগ পেতেন। হরেন্দ্রকুমার বেছে নিলেন শিক্ষকতার কাজ। সে সময়ে কলেজের সংখ্যাও ছিল কম এবং শিক্ষকতা-কার্যে আয়ও অধিক ছিল না, তথাপি তিনি শিক্ষকতার পথ নির্বাচিত করলেন। তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে একটী শিক্ষকের কাজ পেলেন অথচ মাসিক মাহিনার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কয়েকমাস ঐ কাজে নিযুক্ত থেকেও হরেন্দ্রকুমার কোনো বেতন পাননি অথচ এতে তাঁর উৎসাহ কমেনি। দারিদ্র হরেন্দ্রকুমার এইভাবে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মনে রইল।

কিছুদিন পরে বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে তাঁর আহ্বান এল অধ্যাপনার জন্যে। সেখানে তিনি ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকের পদ পেলেন। কলেজের অধ্যক্ষ অন্যত্র চলে যাওয়ায় হরেন্দ্রকুমার সেখানে অধ্যক্ষের পদ পেয়েছিলেন। আবার কিছুদিন পরে তাঁর আহ্বান এল কলকাতা থেকে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিটি কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের পদ পেলেন ও অবিলম্বে যোগদান করলেন। সুদীর্ঘ দিন শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত থেকে এই কলেজের অধ্যাপকরূপেই তাঁর খ্যাতি যার-পর-নাই বর্ধিত হতে থাকে।

City College-এ ১৫ বছরকাল হরেন্দ্রকুমার সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এই কৃতী অধ্যাপকের গুণের কথা শুনেছিলেন; কলেজের চালনায় অনেক প্রয়োজনীয় কাজে তাঁর সঙ্গে ডাঃ মৈত্র আলাপ করতেন। দিবারাত্রি কঠোরতম পরিশ্রম করে হরেন্দ্রকুমার প্রতিটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সুনামের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন।

এই কর্মদক্ষতা জীবনের পাথেয় হয়ে রইল। কলেজের অধ্যাপনা ব্যতীত তিনি তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশসেবার কাজেও যোগদান করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন জনহিতকর কাজে তিনি নিমগ্ন হলেন ও দেশবন্ধুকে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। আর্ত জনগণের সেবা হরেন্দ্রকুমারের জীবনের কর্তব্যব্রত হয়ে রইল।

ক্রমশঃ তাঁর সুনাম দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিম, হরেন্দ্রকুমারের সুনামের কথা তিনি অনেক শুনেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি তখন ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান যেন সর্বোচ্চে স্থাপিত হয় ও এসিয়ার মধ্যে সুমহান স্থান গ্রহণ করে। বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হতে লাগল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অকাতরে অর্থব্যয় করে আশুতোষ পৃথিবীর নানা স্থান থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে এলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ হরেন্দ্রকুমারকে ডেকে বললেন, তুমি আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আস না কেন? ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ ছেড়ে দিলে কেন? হরেন্দ্রকুমার কিছুটা অভিমান করে এই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হরেন্দ্রকুমার বললেন—আমার থেকে কত নতুন শিক্ষক এফ্. এ পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন আর আমার কোনো পরিবর্তন নেই।

স্যার আশুতোষ সমস্ত ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারলেন এবং বললেন, এবার থেকে হরেন্দ্রকুমারের কাছে বি-এ অনার্সের কাগজপত্র যাবে।

শুধু তাই নয়, স্যার আশুতোষ সেই বছরেই হরেন্দ্রকুমারকে part-time শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে হরেন্দ্রকুমার সিটি কলেজ ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোপুরিভাবে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন।

সিটি কলেজে লব্ধ বিপুল অভিজ্ঞতায় হরেন্দ্রকুমার সুষ্ঠুভাবেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ে এম-এ ক্লাশের কাজ সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করতে লাগলেন। অনতিবিলম্বে হরেন্দ্রকুমারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হ'ল। স্যার আশুতোষ তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই বলেছিলেন, তোমাকে পি. এচ. ডি হতে হবে। স্যার আশুতোষের কথা হরেন্দ্রকুমারের মনে লাগল। তিনি যেন ঊদীয়মান শিক্ষাব্রতীকে ক্রমশঃ নিকটতর করে আনছিলেন। তাঁর কথামত তিনি পি. এচ. ডি উপাধির জন্য সচেষ্ট হলেন। অবিলম্বে হরেন্দ্রকুমার গেলেন স্যার ব্রজেন্দ্র শীলের নিকটে—পরামর্শ নিলেন; তার পরে সুরু করলেন ইংরাজী সাহিত্যের উপন্যাস নিয়ে গবেষণা। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুচিন্তিত গবেষণার ফলে হরেন্দ্রকুমার ডক্টরেট পেলেন অর্থাৎ হলৈন পি. এচ. ডি। সামান্য পয়সা জমিয়ে এক সময়ে তিনি এস. সি. আঢ্যের পুস্তকের দোকান থেকে ডিকেন্স ও স্কটের বই কিনতেন নিয়মিত-ভাবে, এতদিন পরে সেইসব পড়াশোনার সুফল পাওয়া গেল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজসমূহের পরিদর্শক বা Inspector পদে নিযুক্ত হলেন অর্থাৎ Inspector of Colleges। বঙ্গদেশের কলেজসমূহের বিষয় হরেন্দ্র-কুমারের জ্ঞান ছিল অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমস্ত কলেজের দেখাশোনার ভার পড়ল তাঁর উপরে, এই নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। বিশ বছর যাবৎ তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন ও অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে ও দানে এবং সুন্দর সংগঠনে বাঙ্গালাদেশের সব কলেজই তাঁর কাছে ঋণী হয়ে আছে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার অবসর গ্রহণ করেন। এই বারে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার প্রধান বা Head নিযুক্ত করা হ'ল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাঃ হরেন্দ্রকুমার ইংরাজী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে খুবই যোগ্যতার সঙ্গে কাজ চালিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি নানা ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন ও জ্ঞান বিতরণে ব্রতী হয়ে অনেককে অর্থসাহায্যও করেন; তিনি শিক্ষাব্রতীদের দিয়েছিলেন

নানারকম উপদেশ। এইভাবে পরিপূর্ণ বয়সে দেশসেবা করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সুন্দর, নম্র ও বিনয়ী স্বভাব ছাত্রদের আকর্ষণ করত। আজীবন তাঁর সাধনার স্থান ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্নতির স্বপ্নই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও একমাত্র সাধনার বিষয়। এমনভাবে কোনো শিক্ষাব্রতী বোধ করি তাঁর জীবন ও মনকে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সাধনায় উৎসর্গ করেননি। তাঁর সাধনার ফল কখনও মুছে যাবে না। আজীবন সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ হরেন্দ্রকুমার ছাত্রদের কল্যাণার্থে দিয়ে গিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। নিজের স্বচ্ছ, সরল জীবন-ধারা তিনি কখনও ত্যাগ করেননি ও দাম্ভিকতা কখনও তাঁকে পেয়ে বসেনি। ছাত্রদের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় অনেকে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর লেখা কয়েকটি পুস্তক বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় হরেন্দ্রকুমার পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হলেন, এবারে হলেন চ্যান্সেলার। এতে তাঁর আনন্দ হয়েছিল অপরিসীম। আবার যেন হারাণো সম্পর্ক নতুন করে ফিরে পেলেন। আইনতঃ উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববিষয়ের জন্য দায়ী থাকবেন সুতরাং তাঁকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক কাজে পরামর্শ দিতে হ'ত। হরেন্দ্রকুমার সানন্দে তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা উপদেশ দিতেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হরেন্দ্রকুমারের জীবনে এল কাজের বন্যা। দেশকে তিনি মনেপ্রাণে ভালবাসতেন তাই জনসেবা ছিল তাঁর একটী ব্রত। নানা স্থানে সভাসমিতি তিনি করতে লাগলেন। ভারতের অর্থনীতি, মাদক-নিবারণী, কংগ্রেস আন্দোলনের অগ্রগতি ও খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও আদর্শ-সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। মহাপ্রভু খ্রীষ্টের শিক্ষাই তাঁর ছিল জীবনাদর্শ এবং ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের কল্যাণ তিনি সর্ব সময়ে কামনা করতেন। তিনি চাইতেন যেন খ্রীষ্টীয় সমাজ অর্থনীতি, কৃষিবিদ্যা ও শিক্ষায় অগ্রণী হয় এবং সমাজে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ায়। খ্রীষ্ট-সমাজে গণ-চেতনার জন্য তিনি বঙ্গদেশে বহু খ্রীষ্টীয় গ্রাম পরিদর্শন করেন ও বক্তৃতা দেন। সমাজের নিকটে তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশ ছিল ভিন্নতর। তাদের সত্যকার অবস্থা ও ভবিষ্যতের জন্য তাঁর পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন।

খ্রীষ্ট-সমাজে তাঁর বক্তৃতামালা এক নূতন ভাবের ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তিনি সমাজকে সর্বদা আত্মনির্ভরশীল ও দেশসেবী হতে উপদেশ দিতেন। বিদেশী মিশনারীদিগের সাহায্যের উপরে অধিক নির্ভরশীল থাকা তিনি খুব কল্যাণজনক বলে মনে করতেন না এবং একাধিক সভা-সমিতিতে সমাজের তরুণ-তরুণীদিগকে শিক্ষায় অগ্রণী হতে ও সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ হতে উপদেশ দিতেন। দেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে তিনি খ্রীষ্ট-সমাজের সকলকে মেলামেশা ও ভাবের আদানপ্রদান করতে বলতেন।

সকল সময় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার দীন-দরিদ্র খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা-ভগ্নীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করতেন ও তাদের উন্নতির কথা চিন্তা করতেন। তিনি সমাজের Separate Electorate অথবা বিশেষ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং বলেছিলেন ঐ ব্যবস্থায় খ্রীষ্টীয় সমাজ কোনোদিন আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না। অনেক সময় পরনির্ভরশীলতার জন্যে তিনি যুবকদের তিরস্কার করতেন।

তিনি নিজ জীবনে দেখিয়েছেন কিভাবে অধ্যবসায়ের দ্বারা শিক্ষায় সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জ্ঞানের ও গুণের আদর করেছিলেন এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলার ব্যাঘ্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন।

১৯৩৭–৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হরেন্দ্রকুমার নিখিল-ভারত খ্রীষ্টীয় সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। উক্ত সময়ে তিনি বহু বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় জননেতার সংস্পর্শে আসেন ও ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের ভবিষ্যৎসম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। নিজেদের আলস্য, পরনির্ভরতা ত্যাগ করে তিনি ভারতীয় খ্রীষ্ট-সমাজকে দেশের মধ্যে সম্মানজনক আসন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষা, দেশসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি খ্রীষ্ট-সমাজকে দেশবাসীর সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ হতে উপদেশ দেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশের চারিদিকে অসহিষ্ণুতার আগুন জ্বলতে থাকে ও সাম্প্রদায়িকতা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ঠিক সেই অশুভ মুহূর্তে হরেন্দ্রকুমার দাঁড়ালেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীর নম্রকণ্ঠে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ও ভুল পথ থেকে নিরস্ত করতে। অনেকের নিকটে তাঁর উপদেশ হয়ত তিক্ত লেগেছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হরেন্দ্রকুমার

বুঝেছিলেন দেশের সকলের সহিত একসঙ্গে চলাই হ'ল শ্রেয়স্কর পথ; বিশেষ অধিকার, সুবিধা সমাজকে বেশি দিন, বেশী দূরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। তাই All-India Christian Conference-এর মাধ্যমে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলেন এবং ভেদবুদ্ধির মধ্যে নূতন ভাবধারার সঞ্চার করেন। তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদে সমাজ জেগে উঠল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অকুণ্ঠচিত্তে এই মনোভাবে প্রশংসামুখর হয়ে উঠলেন। খ্রীষ্ট-সমাজের প্রতি হরেন্দ্রকুমারের উদাত্ত আহ্বান একাধারে সমাজে নবজীবনের সঞ্চার করল অন্যদিকে ন-খ্রীষ্টীয় সমাজ এই উদার মনোভাবে খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রতি অধিকতর সহনশীল ও মনোযোগী হয়ে উঠলেন। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় সমাজ যাতে ভারতের মধ্যে যোগ্যতম আসন লাভ করে এই ছিল ডাঃ মুখার্জীর ঐকান্তিক মনোবাসনা। যদিও বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় খ্রীষ্ট-সমাজ দেশনায়কদের কাছে বিশেষ সুবিচার লাভ করেননি, কি শাসনব্যবস্থায় কিম্বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় অথবা Parliament-এ, তথাপি খ্রীষ্টীয় সমাজের দৃঢ় মনোভাব ও আদর্শ একদিন নিশ্চয় স্বীকৃত হবে। ডাঃ মুখার্জীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় দ্বিতীয় বৃহত্তম লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়হিসাবে একদিন যোগ্যভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হবে এবং খ্রীষ্ট-সমাজের প্রতি যে সব অবিচার ও ঘৃণাভাব বিদ্যমান আছে সে সব একদিন তিরোহিত হবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষ খ্রীষ্টীয় সমাজের গুণাগুণ দেশবাসী নিশ্চয় হৃদয়ঙ্গম করবেন। শান্তিপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক জাতিহিসাবে খ্রীষ্ট-সমাজ দেশের বিবিধ মঙ্গলসাধন করবেন এবং তা' দেশবাসী স্বীকার করবেন। এইভাবে হিংসা, ঘৃণা ও অবিচার বন্ধ হবে অবশেষে খ্রীষ্টীয় সমাজের মহান আদর্শে বিমুগ্ধ হয়ে দেশবাসী খ্রীষ্টানকে দিবেন সুবিচার। হরেন্দ্রকুমার সাম্প্রদায়িকতাকে বড় ঘৃণা করতেন, তাঁর ধারণা ছিল এই বিষ সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হলে শুধু খ্রীষ্ট-সমাজের সর্বনাশ করবে না পরন্তু অন্যান্য লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়েরও ক্ষতি সাধন করবে। হিন্দু, মুশ্লীম, খ্রীষ্টীয়ান সবাই ভারতের সন্তান-সন্ততি, কেউ বড় নয়, ছোট নয়। হরেন্দ্রকুমারের শিক্ষা ছিল যে ন-খ্রীষ্টীয়ানের মত তাঁরাও দেশের সন্তান-সন্ততি এবং তাঁরা যেন সর্বদাই নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করেন। অনেক হিন্দু ও মুশ্লীমদিগের ভুল

ধারণা ছিল বা এখনও আছে যে খ্রীষ্টীয় সমাজ বিদেশী ভাবাপন্ন, এবং তাঁদের ধর্ম বিদেশী। এই ভ্রমাত্মক ধারণা খুবই অন্যায়, খ্রীষ্টধর্ম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় এসিয়ার এবং এই ত্যাগের ধর্ম হল অতি সুপ্রাচীন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি বিদেশী বা বিজাতীয় ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্মের মূলমন্ত্র প্রেম, ত্যাগ ও ক্ষমা, ও এই আদর্শের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ধর্মের আদর্শের যথেষ্ট মিল আছে, সুতরাং খ্রীষ্টধর্মকে বিদেশী ধর্ম বলা শুধু ভুল নয়—খুবই অন্যায়। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ হল প্রাচ্যদেশীয়, এর মধ্যে বিজাতিত্ব কিছুই নেই। তবে ইংরাজরাজত্বের আমলে ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কমবেশী বিদেশী মিশনারীদিগের উপরে আর্থিক সাহায্যের জন্য কিছুটা নির্ভরশীল ছিল। সুখের কথা খ্রীষ্টধর্ম এখন প্রাচ্যভাবেই সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে, মণ্ডলীগুলিও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে। খ্রীষ্ট-সমাজ এখন অপেক্ষাকৃত আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনবছর ধরে হরেন্দ্রকুমার নিখিল-বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক-সমিতি ও নিখিল-বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-সমিতির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তাঁর তৃতীয় কর্মক্ষেত্র হ'ল আইনপরিষদ। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে নূতন আইনপরিষদ নির্বাচিত হয়। সেই সময় বঙ্গদেশ ছিল অবিভক্ত। ডাঃ মুখার্জী সেই সময়ে ভারতীয় খ্রীষ্টানের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় স্থান লাভ করেন। ১৯৩৭-৪২ পর্যন্ত হরেন্দ্রকুমার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং সেখানে যোগ্যতার সহিত খ্রীষ্ট-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। তখনই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। পরিষদ-পাঠাগারে তিনি অনেক সময় পর্যন্ত পড়াশোনায় কাটাতেন। যখন আইনপরিষদে ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের বিরুদ্ধে অন্যায় সমালোচনা হ'ত তখন হরেন্দ্রকুমার তীব্রভাবে সেই সমালোচনার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেন এবং খ্রীষ্টীয় সমাজ যে দেশপ্রেমিক তা' ভালো করে সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। খ্রীষ্টীয় সমাজ যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরাও যে কোনো সমাজের নীচে নয় তা' হরেন্দ্রকুমার সমালোচকদের বোঝাতেন। এই দেশপ্রেমিক সন্তান ডাঃ মুখার্জী জোর গলায় প্রচার করলেন যে খ্রীষ্ট-সমাজ দরিদ্র হলেও তাঁদের অবদান আছে, তাঁরা কারো অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নয় এবং তাঁরা বিশেষ অধিকার বা Special Reservation চান না। এই মনোভাবে সমগ্র দেশে একটা

াড়া পড়ে গিয়েছিল এবং এই নূতন নীতিকে সবাই জানালেন সাধুবাদ সাদর অভ্যর্থনা। খ্রীষ্ট-সমাজে এইরূপ বলিষ্ঠ ও জাতীয়তাপূর্ণ াব ইতিপূর্বে প্রকাশ পায়নি। হরেন্দ্রকুমার শিক্ষাবিষয়ে কোনোরূপ াম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রশ্রয় দেন নাই। হিন্দু-শিক্ষা, মুশ্লীম বা খ্রীষ্টীয় ৈক্ষা বলে তিনি কিছু মানতেন না। ভারতীয় গণপরিষদে ডাঃ মুখার্জী ১৯৪৭-৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সভ্য ছিলেন, পরে সহঃ সভাপতি পদে উন্নীত ন এবং এই সময়ে তাঁর উদারতা ও খ্রীষ্ট-সমাজের প্রকৃত মনোভাব ও আদর্শ র্বসমক্ষে প্রকাশ করে প্রশংসা লাভ করেন। বিশেষ করে সর্দার প্যাটেল ঃ মুখার্জীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবে খ্রীষ্ট-সমাজের প্রতি খুসী হন ও সেই াদর্শের প্রশংসা করেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন উক্ত গণপরিষদের ভাপতি ছিলেন ও হরেন্দ্রকুমার প্রায়ই সভাপতির কাজ ও করতেন। ডাঃ সাদের অসুস্থতার সময়ে হরেন্দ্রকুমার সুষ্ঠুভাবে গণপরিষদের কাজ লাতেন। প্রথম থেকে তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের বিশেষ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং সেইজন্য গণপরিষদের মুশ্লীম, পার্শী, শিখ, াংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্যগণ ইহাতে বিস্মিত হন। এই দৃঢ় মনোভাব অন্যান্য াধিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে রেখাপাত করে। নাগরিক মৌলিক অধিকারবিষয়ে ভাপতিরূপে হরেন্দ্রকুমারের মতামত শুনে সকলে সবিশেষ সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হন।

তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হলেও সামান্য সামান্য করে র্থ জমিয়ে তাঁর সর্বস্বই দান করে নিজের মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে ায়েছেন। দরিদ্র ছাত্রদের কৃষিশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, অর্থনীতি ও টকনিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য তিনি বহু অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গচ্ছিত রখে যান। ভারতীয় খ্রীষ্টীয় ছাত্রদের জন্য যে অর্থ প্রথমে তিনি গচ্ছিত রেখেছিলেন পরে সে অর্থের সর্ত পরিবর্তন করে তা' সর্বসাধারণের জন্য াখে যান। সর্বসমেত হরেন্দ্রকুমারের দান ১৫ লক্ষ টাকার কম হবে না। ধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পুস্তকপ্রণয়নে নিজ পরিশ্রমের যাবতীয় অর্থ এরূপভাবে দান প্রায় দেখা যায় না।

একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে তিনি প্রথমে ২ লক্ষ টাকা দান করেন। গণ-ারিষদের মাহিনা এবং allowance গ্রহণ না করে তিনি সব টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

বাঙ্গলার রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পরে তাঁর সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর বেশভূষা ও নম্রতা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের কোনো রাজ্যপাল বোধ হয় এত সরল ও অনাড়ম্বর পোষাক পরেননি। হরেন্দ্রকুমারের সাথে সব সময় তাঁর স্ত্রী শ্রীবঙ্গবালা মুখার্জীকে দেখা যেত। রাজ্যপালের মত তিনিও নম্র ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে স্ত্রী বঙ্গবালা মুখার্জীর নামে তিনি তাঁর শেষ দান রেখে যান।

রাজ্যপালের মাসিক মাহিনা ৫,৫০০ টাকার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে দান-ভাণ্ডারে ৫,০০০ করে টাকা সঞ্চিত হতে লাগল। মেয়েদের নার্সিং শিক্ষার জন্য এই দান ছিল। যক্ষ্মারোগীদের সাহায্যের জন্য হরেন্দ্রকুমার যক্ষ্মা-ভাণ্ডার খুলে দেশবাসীকে তাতে অর্থ সাহায্য করতে আহ্বান করেন এবং এই ভাণ্ডার তাঁর একটী মহৎ প্রয়োজনীয় কীর্তিবিশেষ। এই সাহায্যভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করবার জন্য তিনি খেলা, সিনেমা, লটারী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করেন। তাঁর আহ্বানে দেশবাসী সাড়া দিলেন। অনেক অর্থ উঠেছিল রাজ্যপালের যক্ষ্মাভাণ্ডারে। এমন কি স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরাও অর্থ জমিয়ে ডাঃ মুখার্জীর হাতে সেই অর্থ প্রদান করে। যক্ষা রোগীদের জন্য এই কীর্তি সত্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—কারণ ইতিপূর্বে এরূপ বিপুল প্রচেষ্টা হয় নাই।

দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য তিনি দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। দেশবন্ধুর দার্জিলিং-এর আবাস সেই অর্থে কেনা হয়েছে। সেখানে একটী মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে একটী যক্ষ্মা-সেবাসদনও গড়ে তোলা হয়েছে। ডাঃ মুখার্জীর মন দরিদ্র যক্ষ্মা-রোগীদের জন্য কাঁদত তাই তিনি তাদের সাহায্য করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। পরের দুঃখ-যাতনাকে এভাবে কে আর নিজের দুঃখ-যাতনা বলে মনে করেন। এখানেই মহাপ্রভু খ্রীষ্টের শিক্ষাকে তিনি কার্যকরী করলেন—যাহা পরের প্রতি করিলে তাহা আমারই প্রতি করিলে। তিনি দরিদ্র যক্ষ্মারোগীদের জন্য বিশ্রামাগারও প্রতিষ্ঠিত করলেন। হরেন্দ্রকুমারের আকুল আবেদনে ও পরিপূর্ণ চেষ্টায় দেশবাসীরা অকাতরে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। এবং এর মধ্যে তাঁর বিন্দুমাত্র স্বার্থ ছিল না।

৭৮ বৎসরে পরিণত বয়সে ৭ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক-গমন করেন।

মহামান্য মেট্রোপলিট্যান ও লর্ড বিশপ মহোদয় এক ভাবগাম্ভীর্যময় প্রার্থনা অনুষ্ঠানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সমাধিস্থলে শোকাকুল হয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের ভালবাসা ও ভক্তি নিবেদন করেন। দেশের দরিদ্র জনগণ—যাঁরা তাঁর কাছে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলেন, তাঁরা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন। এতেই হরেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তা সুপ্রমাণিত হয়। সারা দেশবাসী অশ্রুবিগলিত হয়ে উঠেছিলেন। দেশের মহান নেতার মত তিনি সম্মান পেলেন।

তাঁর মৃত্যুতে সরকারী, আধা সরকারী আপিস, দোকান, সবই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে বন্ধ হয়ে যায়। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীনেহেরু, ডাঃ বিধান রায় প্রমুখ দেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও মনীষীগণ তাঁর তিরোধানে সশ্রদ্ধভাবে শোকপ্রকাশ করেন। প্রবীণ শিক্ষাবিদ, দানবীর, রাজনীতিবিদ, খ্রীষ্ট-সমাজনেতা ও দেশসেবক হরেন্দ্রকুমারের মৃত্যুতে সারা ভারত, বিশেষ করে বঙ্গদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হ'ল। দরিদ্র ছাত্র, আর্তজন, ও রুগ্ন তাঁর মত পরম সুহৃদ কি আর পাবে? এই দীন ভক্ত, দেশসেবক ও প্রবীণ শিক্ষাবিদকে সারা বাঙ্গলাদেশ কখনও বিস্মৃত হতে পারবে না। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা বারবার প্রণতি জানাই।

আচার্য বিমলানন্দ নাগ

বিমলানন্দ, জ্ঞানের আনন্দ সৌম্য মূরতি তব,
তোমার সেবায় ধন্য সমাজ, চরণের ধূলি লব।—
খ্রীষ্টের লাগি, সবকিছু ত্যজি জীবন করিলে দান,
প্রচারিলে তাঁর অমৃত মন্ত্র রহে তব অবদান।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নাগবংশে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিমলানন্দের জন্ম হয়। তিনি ঢাকা কলেজে আই. এ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। নিজ আত্মকথায় বিমলানন্দ লিখেছেন যে তাঁদের গৃহে একটী বিরাট গাছ ছিল যেটিকে গ্রামবাসীরা সভয়ে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন এবং সেই বড় গাছটির শিকড়ে কেউ ভুলেও পা ছোঁয়াতেন ন। সবার ভয় ছিল বৃক্ষদেবতা চরম প্রতিশোধ নেবেন। তিনি বলেন যে আশৈশব তাঁর এই সব দেব-দেবী ও বৃক্ষদেবতার উপরে তাঁর বিশ্বাস হ'ত না অথচ সাহস করে সে কথা প্রকাশ করতেন না। পিতা পরমেশ্বরের উপরে বিমলানন্দের অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব ছিল না : ক্রমশঃ এই মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছেলেবেলায় বিমলানন্দ শুনেছিলেন যে দুইজন হিন্দু ভদ্রলোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। গ্রামবাসীদের বিরূপ সমালোচনা ও টীকা-টিপ্পনীও তাঁর কানে এসেছিল। কিন্তু মনের গোপনপ্রান্তে বিমলানন্দের প্রভু খ্রীষ্টের প্রতি একটা ভক্তিবিশ্বাস এবং তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ইচ্ছা ছিল। আবার তিনি ব্রাহ্মদেরও সংস্পর্শে আসেন এবং এই সময়ে তিনি নানা পরীক্ষা ও দুঃখকষ্টে পতিত হন। ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে এসে তিনি বহুবিধ নীতিকথা ও ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করেন। তার মধ্যে বারোটী শিক্ষা খুব প্রয়োজনীয় ছিল। একটী ছিল সর্বদা সত্য কথা বলা ও অপরটি মিথ্যাকে চিরকাল ঘৃণা করা। ছেলেবেলায় তাঁর একটী বড় দোষ ছিল তা' হচ্ছে সংস্কৃত-পরীক্ষায় নকল্ করা। ভাগ্যক্রমে কোনো খ্রীষ্টীয় মহিলার লেখা

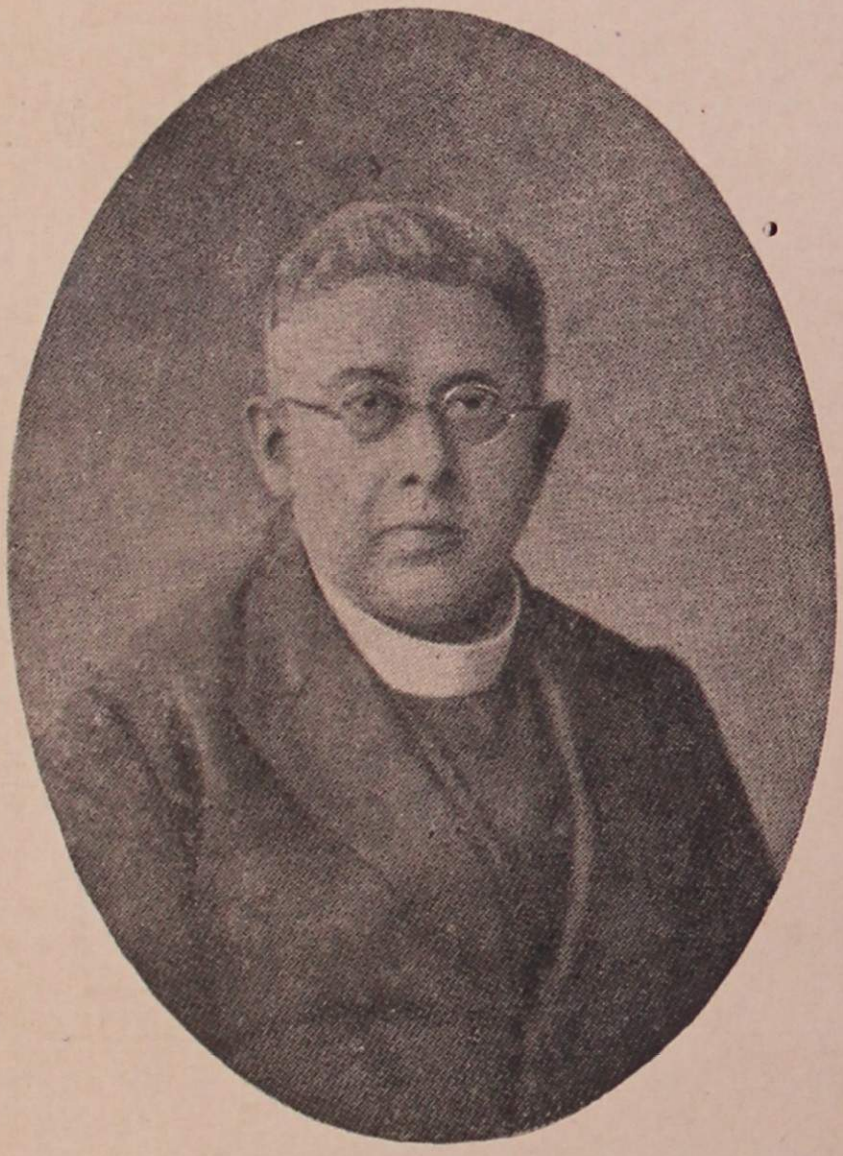

আচার্য বিমলানন্দ নাগ

SERAMPORE

একখানি বই তাঁর হাতে আসে এবং সেটী তিনি সযত্নে প্রতিদিন মনোযোগ-সহকারে পড়তেন। একটী পংক্তি ছিল—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং আমরা অতি দুর্বল ও পাপী; আমরা যদি পতিত হই ঈশ্বর আমাদের আবার উঠাবেন। এই পুস্তিকাখানি যার-পর-নাই পাঠ করে বিমলানন্দ মহাপ্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। আরো অধিক জানবার ইচ্ছা হয় মহাপ্রভুর শিক্ষা ও গুণের কথা। তাঁর অলৌকিক শক্তি ও জ্যোতি তিনি দেখতে চাইলেন। এতদিন বিমলানন্দ অলীক শান্তিকথার পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন এবং অবশেষে সত্য ঈশ্বর ও শান্তির সন্ধান লাভ করেন। তিনি পরম শান্তির আগার খ্রীষ্টের সহিত সম্যক পরিচিত হন। এই মহান চিন্তা যখনই তাঁর মনে উদিত হ'ল তিনি তখন একজন খ্রীষ্টীয় মিশনারীর নিকটে গোপনে একখানি বাইবেল শাস্ত্র কিনতে ছুটলেন। সে আগ্রহ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দুঃখের বিষয় একটীও বাইবেল পাওয়া গেল না। সেই সদয় মিশনারী কিন্তু মুক্তিদাতা খ্রীষ্টের অতুলনীয় শক্তি ও জীবনীর কথা বিমলানন্দকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে শিক্ষা পেলেন কিন্তু তখন তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু ও ত্যাগের বিষয় শোনেননি। নব ভক্তের গোপন মনে ভক্তি খ্রীষ্টকে জানবার আগ্রহ এল। তার পরে পুরোহিত মহাশয় তাঁকে নিয়ে হাঁটু পেতে কর-যোড়ে প্রার্থনা করলেন। ভাবাবেগে তিনি বলে চললেন—"পরম পিতা, এই যুবক আপনার আলোক দেখেছে, কিন্তু আপনার পূর্ণতম জ্যোতিঃ দেখেনি। হে প্রভু আপনি তাকে পূর্ণতর আলোক দিন যেন সে বুঝতে পারে যে যীশুই পিতা পরমেশ্বর।"

বিমলানন্দ প্রায়ই খ্রীষ্টধর্মের বিষয়ে মিশনারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আনন্দ পেতেন। একদিন তাঁকে বলা হ'ল যে জগতে একদিন সকলেই প্রভু খ্রীষ্টের চরণতলে আসবে।

চট্টগ্রাম ত্যাগের সময় বিমলানন্দের বাবা তাঁর উপর ভাল ব্যবহার করেন-নি। বিমলানন্দ অনেক সময় ব্রাহ্মদের সঙ্গেও মেলামেশা করতেন ও ধর্মালোচনায় যোগ দিতেন। এধারে নিয়মিত তিনি বাইবেল শাস্ত্র পড়তেন ও মনে পরম শান্তি পেতেন। বাইবেল পড়া তাঁর একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরে তাঁরা ঢাকায় চলে যান। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে

বিমলানন্দ Rev. R. Wright Hay-কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। Rev Hay-র প্রচেষ্টায় তিনি খ্রীষ্টের চরণাশ্রিত হন। কিশোরবয়স থেকে তাঁর ধর্মে প্রবল অনুরাগ বর্তমান ছিল। মিঃ উইলসন, স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, ডাঃ পি. কে. রায়, অঘোর চট্টোপাধ্যায় এই সব ভদ্রমহোদয়ের সাথে পরিচিত হন ও তাঁদের সংস্পর্শে আসেন। কবি অতুলপ্রসাদ ও প্রসিদ্ধ হোমিও ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য বিমলানন্দের আশৈশব বন্ধু ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। সে সময়ে অনেক খ্রীষ্টীয়ান কংগ্রেসে যোগদান করতেন না কিন্তু নির্ভীক বিমলানন্দ সমাজের কল্যাণার্থে কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করে নানা কাজে সহায়তা করতে থাকেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয় তখন তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে Moderate বা নরম-পন্থী দলে যোগদান করেন। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সহিত বিমলানন্দ বাঙ্গলার National Liberal League-এর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১৯-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড Reform-এর পরামর্শে ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের এবং Moderate দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত হন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনে বিমলানন্দ ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সেই সময়ে সামাজিক মঙ্গলার্থে তিনি মূল্যবান কাজ করেছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের স্বার্থ সুরক্ষিত করেন ও নাগরিকহিসাবে নিজ কর্তব্য সাধন করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশন এক্ট অনুযায়ী প্রথম ভারতীয় খ্রীষ্টীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে All India Christian Conference-এর সভাপতিত্ব করেন। তখন সেখানে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। লাহোরে বিমলানন্দ খ্রীষ্টীয় সমাজের দান ও ঐতিহ্যের কথা প্রকাশ করেন। বিমলানন্দের মত এরূপ স্পষ্টবক্তা আর দেখা যায় নাই ; তিনি খ্রীষ্ট-সমাজের অবদান-সম্পর্কে—কি শিক্ষা, কি কৃষ্টি, কি দেশের বিবিধ বিষয়ে তাঁদের অগ্রগতির কথায় সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে এই সমাজের অবদান স্বীকার করেন। ১৯২৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি

Bengal Legislative Council-এ ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিমলানন্দের মত নির্ভীক দেশপ্রেমিক তাঁর সহজ সুললিত কণ্ঠে যেভাবে খ্রীষ্ট-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন তাতে সমস্ত কাউন্সিল স্থিরভাবে তাঁর যুক্তি ও অপূর্ব বাগ্মিতা শ্রবণ করে বিমোহিত হন। অনেক সময়ে তাঁর যুক্তি নিয়ে আবার কাউন্সিলে ঝড় বয়ে গিয়েছে কিন্তু সেই একজন লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সুদৃঢ় যুক্তি-তর্ক ও অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বাচনে সমস্ত গৃহ মুখরিত হয়ে ওঠে। যখন কোনো দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান তাঁর নিকটে কোনো চিঠি বা চাকুরীর জন্য গিয়েছে বিমলানন্দ তাঁর যথাশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন। মূলকথা তাঁর মত সক্রিয় ও তেজোদৃপ্ত পুরুষ তখন কি কাউন্সিলে কি দেশে অল্পই ছিলেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Baptist World Alliance-এ ভারতের ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন ও ভারতে ব্যাপ্টিষ্ট অবদান ও প্রভুর কাজের বিষয় সাক্ষ্য দেন। কিভাবে ভারতে ঐ মণ্ডলী কার্য করছেন ও কেমন তার অগ্রগতি তা' বিমলানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন। বার্লিনে তাঁর বক্তৃতামালা সেখানে ভারতের প্রতি বিশ্ববাসীর আগ্রহ বর্ধিত করে এবং মূলতঃ তার জন্য বিমলানন্দের অপূর্ব প্রতিভা বিকশিত হয়। ঐ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ব-ব্যাপ্টিষ্ট এলায়েন্সের সহঃ সভাপতি নিযুক্ত হন এবং ঐ সম্মানে ভারতীয় মণ্ডলীর সম্মান বর্ধিত হয়, ভারতীয় মণ্ডলীর প্রতি বিশ্ববাসীর আগ্রহ ও উৎসাহ বেড়ে যায়। এসিয়া-বাসীর মধ্যে অপর কেহ ঐ পদে ইতিপূর্বে নিযুক্ত হন নাই। তিনি বাৎসরাধিক কাল ইংলণ্ড ও নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ তাঁর চেষ্টায় স্থাপিত হয়। (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)

এই ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ স্থাপনের জন্য বিমলানন্দ সারা বঙ্গদেশের ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলী পরিভ্রমণ করেন। কলেজ স্কোয়ারস্থ Students' Hall তাঁহার এক অন্যতম কীর্তি। তিনি Bengal Christian Conference-এর সহ-সভাপতি ও Indian Christian Association-এর সভাপতি হয়েছিলেন। ভারতে Barrows Lecturership-এর সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন। Church Union পরিকল্পনার তিনি একজন দৃঢ় সমর্থক

ছিলেন কিন্তু আজও চার্চ ইউনিয়ন সুদূরপরাহত! মণ্ডলীসম্মিলন আমাদের সার্থক করতে হবে। তিনি Indian Association-এর Vice-President ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুসমাচার প্রচারে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ষ্ট্রীট Y.M.C.A.-তে Asst. Secretary ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের Home Missionary নিযুক্ত হন। তিনি Bengal Film Censor Board-এর একজন সভ্য ছিলেন।

কলেজ স্কোয়ারস্থ Students' Hall-এর কার্য রেভাঃ নাগ দক্ষতার সংগে পরিচালনা করেন ও হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে প্রভুর বাণী প্রচার করেন। বাঙ্গলা দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর প্রচারকার্য বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

Missionary Conference-এর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন বিমলানন্দ। তিনি প্রভু খ্রীষ্টকে একান্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন। সামাজিক শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক কার্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতীয় খ্রীষ্টীয়ান সমাজের উন্নতির জন্য সর্বদা তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হ'ত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি সর্বদাই খ্রীষ্টীয় সমাজের ন্যায্য অধিকারের জন্য আন্দোলন করতেন এবং সমাজের প্রতি অন্যায় করা হলে তিনি দৃঢ়-ভাবে খ্রীষ্টীয়ানদের ন্যায্যাধিকারের জন্য প্রাণপাত করতেন। ১৬ই মার্চ, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিমলানন্দের জীবন ছিল খ্রীষ্টধর্মে উৎসর্গীকৃত জীবন এবং তা' পরিপক্ক হয়েছিল গভীর বিশ্বাস, সাধনা ও ধ্যানে। বাস্তবিকই তিনি সমাজের একজন পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সমাজের রাজনৈতিক চেতনাও তিনি এনেছিলেন।

রেভাঃ লালবিহারী দে

রেভাঃ লালবিহারী দে

গ্রামের ছেলে লালবিহারী
বনশীতল ছায়,
ঘুরে বেড়ায় ফুলের বনে
দূরের অজানায়।
ঘুম ভাঙ্গে তার প্রভুর ডাকে,
মানবত্রাতা চাহেন তাকে;
বিদ্যাবুদ্ধি সব পেল সে
দিল প্রভুর পায়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের সূচনা করেন প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ এলেক্সাণ্ডার ডাফ্। ভারতে সে সময়ে ইংরাজের শিক্ষাধীনে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য ভারতবাসীরা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তখন মিশনারীপ্রদত্ত শিক্ষাকলা এদেশে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। দেশবাসীরা তখন ইংরাজী অধ্যাপকের অধীনে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সবকিছু শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন। ডাঃ ডাফ্ আশা করেছিলেন যে সংস্কারাবদ্ধ দেশে একদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা যতকিছু গলদ ও কুসংস্কার দূরীকৃত করতে সমর্থ হবে। এখনও কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। সে সময়ে General Assembly's Institution ছিল একমাত্র বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা উত্তরকালে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। Institution-এ শিক্ষাকালীন বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষার আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এ সকল অগ্রগতির মূলে ছিলেন মহামতি ডাঃ ডাফ্ যাঁর ইচ্ছা ছিল এ দেশে শিক্ষাবিস্তার ও অন্য দিকে খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ প্রচার।

ভারত-স্কটিশ আধ্যাত্মিক সম্পর্কের একটি মধুর ও সুন্দর ফল হয়েছিল আচার্য শ্রীলালবিহারী দের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে। গ্রামে গ্রামে তাঁর বাপ্তিস্ম-সংবাদ এক নূতন অনুপ্রেরণা এনেছিল। Presbyterian Church

ডাঃ ডাফের নেতৃত্বে এক নবরূপ পরিগ্রহণ করে। ডাঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর সমভিব্যাহারে রেভাঃ লালবিহারী দে বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের অবিসম্বাদী নেতারূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন এ পরম গৌরবের বিষয়। ডাঃ ব্যানার্জী ছিলেন চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, যাঁর অগাধ প্রভাব ছিল সংস্কৃত ভাষা ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে, আর রেভাঃ লালবিহারী দে-র বিশেষ গুণ ছিল তাঁর বাস্তবজ্ঞান, সুযোগ্য পরিচালনা ও বিলক্ষণ বিচারজ্ঞান। এই দুইজন মনীষী ছিলেন বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের কর্ণধার-বিশেষ যাঁদের গুণে, জ্ঞানে ও বিদ্যার অবদানে আজকের সমুন্নত খ্রীষ্ট-সমাজ ঋণী। তাঁদের বিপুল অবদানের কথা চিন্তা করলে এই ধারণা হয় যে তাঁরা না থাকলে সমাজের এই বিশিষ্ট রূপের স্থান থাকত না।

লালবিহারীর জন্মদিবস ছিল ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ। তালপুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক মধ্যবিত্ত হিন্দুপরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর প্রথম নাম ছিল কালাগোপাল ও তিনি গ্রামেরই সন্তানবিশেষ। ডাঃ ডাফের স্কুলে ইংরাজীশিক্ষার প্রাক্কালে লালবিহারীর জীবন কাটে গ্রামে বনশীতল ছায়ে, মাঠের মাঝে তাল ও আম-কাঁঠালের সুগন্ধভরা বনে বনে। জীবনের প্রথম থেকে গ্রামের সন্তান লালবিহারী মনেপ্রাণে ছিলেন গ্রামবাসী, কৃষিক্ষেত্রে বনেজঙ্গলে, বাঁশবনে ঘুরে ঘুরে কৃষি-উন্নতিতে তাঁর মন নিবিষ্ট ছিল। গ্রাম্য স্বাধীনতা, চরিত্রবল, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞান এবং সর্বোপরি তাঁর গৃহশিক্ষা ও পরিবেশ জীবনকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁর কৃষিবিদ্যা দুর্দশাপোষণে যথেষ্ট কাজে লাগত। দরিদ্র কৃষকদের অভাবমোচনে Co-operative Credit Society ও Land Mortgage Bank-এর সুযোগ-সুবিধার গুণাগুণের বিষয় উপলব্ধি করে তিনি তার সদ্ব্যবহার করেন। কৃষিঋণ প্রদানের ও মোচনের একমাত্র উপায় ছিল এই দুই প্রতিষ্ঠান। কালনাতে এইরূপ গ্রাম্য ঋণদান সমিতি স্থাপন করে তিনি গ্রামবাসীর উপকার করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কৃষকদের দুরবস্থা ও তার প্রতিকারসম্পর্কে তাঁর যুক্তি ও বিবৃতি যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। বর্তমান সময়েও সেই বিশদ বিবৃতিটি বঙ্গদেশের কৃষকদের পূর্ণতথ্যসম্বলিত; তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের অনেক প্রয়োজনীয় নানা তথ্য তাতে আছে। গ্রামে চাষীদের বিবিধভাবে

অর্থ উপার্জনের উপায় উদ্ভাবন, এবং গ্রামে তাঁতের কাজের প্রচলন এই বিষয়ে লালবিহারী বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। জাতীয় উন্নতির ভিত্তিতে গ্রাম্য শিক্ষা-বিস্তারসম্পর্কে তিনিই বোধ হয় প্রথম ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটীতে প্রদত্ত রেভাঃ দে-র বঙ্গদেশে প্রাইমারী শিক্ষা-সম্পর্কে উপদেশসম্বলিত প্রবন্ধটী সরকার-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ দে স্কটিশ প্রেসবিটারিয়্যান চার্চের খ্রীষ্টীয় কর্মী-রূপে পরিগণিত হন এবং সেই সময় থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বস্তভাবে মণ্ডলীর সেবা করে যান। প্রেসবিটারিয়্যান চার্চের তিনি একজন অনুগত-সেবক ছিলেন। লালবিহারী একাধারে সর্বজনমান্য পুরোহিত, বিভিন্ন কার্যে অভিজ্ঞ ও লেখকহিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রেভাঃ ধনজিভাই নাওরোজির কন্যাকে বিবাহ করে পশ্চিম ভারতের সহিত পরিচিতি লাভ করেন। বহু ইউরোপীয় মিশনারী যেমন ডাঃ উইলসন তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। একটি মণ্ডলীর পুরোহিত হলেও তিনি বৃহত্তম খ্রীষ্ট-সমাজের নানা হিতকারী প্রচেষ্টার সহিত সর্বদাই সংযুক্ত ছিলেন। তিনি 'জাতীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী' স্থাপন বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

সেই সময়েও ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীর বিভেদের বিরুদ্ধে লালবিহারী প্রমুখ খ্রীষ্টীয় নেতাদের আন্দোলন চালাতে হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী, সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাবে তিনি একজন বিশারদ ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতের বিভিন্ন মণ্ডলীর অস্তিত্ব জাতীয় মণ্ডলীগঠনের পরিপন্থী ছিল। ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী যে খ্রীষ্ট-সমাজের ক্ষতিসাধন করে তাকে শতধা বিভক্ত ও দুর্বলতর করছে এ কথা তিনি ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তিনি অচিরে জাতীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগঠনের বিষয় অহরহঃ চিন্তা করতেন। এই জাতীয়করণের মনোভাব একদিন তিনি কোনো ইউরোপীয় মিশনারীদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ছিল অকাট্য, তাঁর ভাষণ-ভঙ্গী ছিল অতি মনোরম। ঠিক সেই জাতীয়করণ আন্দোলন সুরু হবার সময়ে অকস্মাৎ লালবিহারী সরকারী চাকুরী পেয়ে কলিকাতার বাহিরে গেলেন। তাঁর বিভিন্ন মণ্ডলীর একতার স্বপ্নে তিনি রোমান ক্যাথলিক

সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি সর্বদা উদার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিও সহিষ্ণুতা দেখাতেন।

রেভাঃ দে পৌরোহিত্য পদে বহাল হবার সময়ে ভেবেছিলেন যে ইউরোপীয় ও ভারতীয় মিশনারীদের মধ্যে কোনপ্রকার প্রভেদ থাকবে না কিন্তু দেখলেন, মিশন কাউন্সিল নামক প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ইউরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তার মধ্যে কোনো ভারতীয়ের স্থান নাই; তাঁরা এই উদারতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ভারতীয় পুরোহিতেরা সেই Council-এর সভ্য হতে পারতেন না। ডাঃ ডাফের অনুপস্থিতিতে ডাঃ Mackay সভাপতি ছিলেন কিন্তু তিনি ভারতীয় পুরোহিতবর্গকে সম্মিলনে সমান অংশীদারহিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আচার্য দে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে এই অসামঞ্জস্যের বিষয় উল্লেখ করেছিলেন ও তা Edinburgh-এ প্রেরণ করেন। পরে ডাঃ ডাফ্ প্রত্যাবর্তন করে বিষয়টির সম্মুখীন হন এবং আন্দোলন দমিত হয়ে যায়। কিন্তু আচার্য দে খ্রীষ্টের আদর্শ ও মণ্ডলীর অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করে আন্দোলন চালিয়ে যান। ডাঃ ডাফের সহিত তাঁর পিতৃসম্পর্ক থাকলেও আচার্য দে সমানাধিকারের দৃঢ় দাবী করেন এমন কি পদত্যাগের কথাও উল্লেখ করেন। এই আন্দোলনে অবশেষে আচার্য দে বিজয়ী হন এবং তাঁকে সর্বপ্রথমে একটি স্থানে স্বাধীন দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইভাবে স্বীয় মনোবলের জোরে রেভাঃ দে সমাজে উচচস্থান লাভ করেন ও ইউরোপীয়দিগেরও শ্রদ্ধাভাজন হন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ দে-র স্বাধীনচিত্ততার দৃষ্টান্ত আবার দেখা যায়। ঐ সময়ে বিদ্রোহদমনের পরে বিদ্রোহীদের শাস্তিদানের কথা উঠেছিল। রেভাঃ দে-র চেষ্টায় ইউরোপীয়গণ সে প্রতিশোধ হতে বিরত থাকেন, সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত পরে আচার্য দে অনেক ইউরোপীয় মিশনারীকে লেখেন যেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় আদর্শ, প্রেম ও ক্ষমাশীলতার বিষয় বিস্মৃত না হন। বিদ্রোহীদের হস্তে খ্রীষ্টীয় সমাজের অনেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন যেমন গোপীনাথ নন্দী। লালবিহারীর নেতৃত্বে ও উদার মনোভাবে মিশনারীগণ সাড়া দিলেন এবং জনমতগঠনের দ্বারা বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষমা প্রদান করা হয়। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে লালবিহারী তৎকালীন নানারূপ জাতীয় আন্দোলনের সহিত জড়িত

ছিলেন। একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক হলেও লালবিহারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সূত্রপাত থেকে তিনি তার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় কর্মীরূপে এবং অন্যদিকে বাঙ্গলার চাষীর পরমবন্ধুরূপে তিনি পরিগণিত হতেন। মিশনারী পত্রিকায় তাঁর লেখা যথেষ্ট সমাদৃত হত। জন্ ওয়েস্‌লির মত তিনি আত্মার পরিবর্তন লাভ দেখতে চাইতেন। তিনি সারা বাঙ্গলা পরিভ্রমণ করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে তিনি স্কুল, চার্চ, আশ্রম স্থাপন করে গিয়েছেন যার জন্য তাঁর নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। ডাফ্ চার্চের পুরোহিতহিসাবে তিনি উপদেশে এনেছিলেন এক জীবন্ত ও বাস্তবরূপ। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম উপদেশ দিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

ঠিক সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। রেভাঃ দে ঐ আন্দোলনের উত্তম বিষয় স্বীকার করলেও তাঁর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথাও প্রকাশ করেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও লালবিহারীর খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে নৈতিক ব্যবধান সত্ত্বেও কোনোরূপ অসদ্ভাব বা মনোমালিন্য দেখা যায়নি, বরং তাঁদের মধ্যে গভীর প্রীতি বিদ্যমান ছিল ; খ্রীষ্টধর্ম ও সমাজের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর মূল্যবান নিবন্ধ যথেষ্ট সমাদৃত হতো। তিনি কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনও করতেন। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় কনফারেন্সের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সমাজের মুখপত্রের অভাব মোচনে অগ্রণী হবার ঠিক সময়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি একাধারে ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরাজী গদ্যলেখক ও বাঙ্গালী সাহিত্যিক। তিনি গ্রামবাসী খ্রীষ্টীয়ানের জন্য 'অরুণোদয়' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় বহু ট্রাক্ট রচনা করে তিনি স্বনামধন্য হন ও সেগুলি সারা বাঙ্গলায় প্রচারিত হ'ত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow হিসাবে খ্রীষ্ট-সমাজের স্বার্থরক্ষা করতেন। তিনি খ্রীষ্টীয় সমাজের জন্য Friend in Need Society বা 'বিপদের বন্ধু' সমিতিগঠনে প্রয়াসী হন কিন্তু তা কার্যকরী হবার পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। Indian Christian Association বা ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘেরও তিনি একজন পরম সুহৃদ ছিলেন ও সঙ্ঘ তাঁর উপরে যথেষ্ট নির্ভর করতেন। তিনি প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সদ্‌গুণের ভক্ত ছিলেন। দেশের অগ্রগতির জন্য

তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একজন কংগ্রেসসেবী ছিলেন ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। লালবিহারী কখনও মনে করতেন না যে বাঙ্গালীরা ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে তিনি সর্বদাই ইউরোপীয় বন্ধুদিগকে জাতিবিরোধ ও বর্ণবিরোধ পরিহার করতে বলতেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Searching of the Heart*-এ ইউরোপীয়দিগকে সর্বদা ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই পুস্তিকায় লালবিহারী শিক্ষিত ন-খ্রীষ্টীয়দিগকে দেখান যে খ্রীষ্টধর্মকে বিদেশীয় বলে নিন্দা করা সমীচীন নয়। সেই সময়কার গভীর ইউরোপীয়-বিদ্বেষী ভাব লালবিহারীর এই পুস্তিকা-প্রকাশে ও তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে অনেকাংশে দূরীভূত হয় ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়। সরকার তাঁর অতুলনীয় অবদানের বিষয় অবহিত ছিলেন। অন্যদিকে লালবিহারী কঠোর ভাষায় দেশের দুর্নীতি, কুসংস্কার ও অন্যান্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ জানাতেন।

লালবিহারীর বিবিধ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। তরু দত্ত যেমন ইংরাজী কাব্য লিখে চিরপ্রসিদ্ধা হন তেমনি ইংরাজী গদ্য লিখে লালবিহারী চিরপ্রসিদ্ধ হন। ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা তাঁর অবিরাম পরিশ্রম ও চর্চার ফল। মেকলের মত তিনি লেখায় সযত্ন ছিলেন এবং পড়াশোনায় সমসাময়িকদিগকে ছাড়িয়ে যেতেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের সাথে বাদানুবাদে শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, মহামতি লালবিহারীর পরিশ্রম ও বাগ্মিতার প্রশংসা করেন। একজন ইংরাজ বলেছিলেন যে একজন বাঙ্গালী স্বীয় চেষ্টার বলে ইংরাজের ন্যায় ভাষার দক্ষতা দেখাতে পারেন। তাঁর ইংরাজী ছিল, সুন্দর সরল ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর লিখনভঙ্গীকে Addison ও Goldsmith-এর সহিত তুলনা করা চলে। লালবিহারীর 'গোবিন্দ সামন্ত' পুস্তকটি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি গ্রাম্য ও কৃষি-উন্নতির জ্ঞানে পূর্ণ। তাঁর *Peasant Life in Bengal*, *Bengal Folk Tales* চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁর মিশনারী লেখা Journals-গুলি গ্রামের প্রকৃত অভাব-অভিযোগ ও গ্রাম্য চিত্র বর্ণনা করে।

Calcutta Review পত্রিকায় তাঁর লেখা জাতীয় জীবনে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি শিক্ষাবিভাগে চাকুরী পেয়েছিলেন *Gobindo Samonto* ও *Calcutta Review*-এর সাথে যোগাযোগে ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে। সরকারী চাকুরীতে অধ্যাপকের পদ পেলেও তিনি প্রেসবিটেরিয়্যান চার্চের পুরোহিতরূপে অধিক সম্মানবোধ করতেন। তিনি খ্রীষ্টীয় মিশনারী ছিলেন। হুগলী কলেজে অধ্যাপনার সময়ে তিনি প্রতি রবিবারে চুঁচুড়াতে উপাসনা পরিচালনা করতেন।

ডাঃ ডাফের মৃত্যুতে লালবিহারীর নাম আরো বেড়ে উঠলো। ডাঃ ডাফের সহিত ঘনিষ্ঠতম পরিচয় এবং তাঁর সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর অবদানের জন্য দেশে ও সমাজে তাঁর স্থান অক্ষুন্ন ছিল।

তিনি ২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ডাঃ ব্যানার্জীর মত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব ছিল। মৃত্যুসময়ে তাঁর কন্যা শাস্ত্রের এই কথা আবৃত্তি করেন :

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত ব্যক্তিগণ আমার নিকটে এস, এবং আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আধ্যাত্মিক ও মৃত্যুর পর জীবনের কথা ভাবতেন।

লালবিহারীর অসাধারণ ইংরাজী ভাষায় দখল ও বিখ্যাত ইংরাজ পুরোহিত ও ভারতীয় মিশনারীর সমানাদর্শে বিশ্বাস ছিল। গ্রামের অবস্থা ও কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট তিনি ভালভাবে জানতেন, রাজনীতিতে তিনি কংগ্রেসসেবী ছিলেন। ঘুমন্ত খৃষ্টসমাজে এইরকম দেশহিতৈষীর জন্ম আবার কবে হবে?

ডাঃ কালীচরণ ব্যানার্জী

জীবন তোমার স্বতঃস্বচ্ছল,
জলস্রোতের মত ;—
এগিয়ে চলে আপন বেগে হয় না প্রতিহত।
দুইকূলে তার শ্যামল শোভায়,
ফলভরা গাছ নয়ন জুড়ায়; ;
আর্ত জনার সেবাব্রতে, রইলে তুমি রত ;
তাইত সমাজ দীপ্ত আভায় মহান হল কত!

প্রভু যীশুর শিক্ষাকে কার্যকরী করতে কালীচরণ একজন অগ্রণী ছিলেন। তিনি প্রচারের বিষয়ে খুবই উদ্যোগী ছিলেন। ধর্মান্তরকরণে মানুষের হৃদয়ে নবীনতা দান করে ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করে। তিনি ছিলেন সর্বান্তঃকরণে একজন দেশহিতৈষী এবং দেশবাসীর সেবাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। নাগরিকহিসাবে তিনি সমাজসেবা, রাজনীতি, শিক্ষা ও ধর্ম-কার্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত রেখেছিলেন। যে কোনো কাজেই কালীচরণ তাঁর বৈশিষ্ট্য রেখেছিলেন। তিনি যেন জীবিতকালে নেতৃত্ব করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু, নামজাদা এ্যাডভোকেট, শিক্ষক, কর্পোরেশনের সভ্য, বঙ্গীয় কাউন্সিলের সভ্য, রাজনীতিবিদ, সমাজসংস্কারক, ওয়াই. এম. সি. এ.র দৃঢ় সমর্থক এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর একজন বিশ্বাসী সেবক; উপরোক্ত বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করা যায়। তিনি ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জব্বলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন এবং সেইজন্য তিনি খান্নানে (হুগলী) মানুষ হতে লাগলেন। শৈশবাবস্থা থেকে গোঁড়া হিন্দু প্রথানুযায়ী বর্ধিত হতে লাগলেন এবং তাঁর ধর্মভাব ও দয়া-দাক্ষিণ্যও বেড়ে উঠতে লাগল। হুগলী Collegiate School-এ শিক্ষালাভের পরে তিনি Oriental Seminary-তে ভর্তি হন। পরে তিনি Free Church Institution-এ যোগদান করেন।

ডাঃ কালীচরণ ব্যানার্জী

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি I.A. পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মাসিক বৃত্তি লাভ করেন এই সুবিধায় তিনি যথেষ্ট উপকৃত হন ও পরিবারেও কিছু সাহায্য দিতে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ায় তিনি অনেকটা অভাব-মুক্ত হন ও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। পরীক্ষায় তিনি চতুর্থস্থান অধিকার করেন। তার পর তিনি Free Church College-এ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবৎসর তিনি দর্শনশাস্ত্রে M.A. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন। সেই সময় তাঁর মাসিক মাহিনা ছিল ৩০০৲। এই বিশ্বাসী ছাত্রের মনে ডাঃ ডাফের উপদেশামৃত বিশেষভাবে প্রার্থনামূলক উপদেশ ও ঈশ্বরের সহিত প্রার্থনায় যোগাযোগের বিষয়ে শিক্ষা-গুলি তাঁর অন্তরলোককে স্পর্শ করে। কলেজ পরিত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে না এসে পারেননি। কালীচরণের কাহিনীতেই তিনি নিজ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"শেষে আমি পরিত্রাতার নিকটে আনীত হলাম, একজন চিকিৎসক মিশনারী এই যোগা-যোগে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর অমূল্য প্রভাবে; তাঁর প্রার্থনাশীল জীবনে আকৃষ্ট হয়ে আমি পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাই।" তাঁর আর একজন সহযোগী বন্ধু শ্রী বি. এল. চন্দ্রের প্রভাবও কম ছিল না, শ্রী চন্দ্র খ্রীষ্টীয়ান হলেও বাপ্তাইজিত হন নাই। তিনি এবং কালীচরণ একত্রে বাইবেল পাঠ করতেন ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকতেন। অবশেষে কালীচরণ তাঁর স্নেহময়ী মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিকটে স্পষ্টভাবে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাঁর ধর্মান্তরের প্রস্তাবে তাঁর মায়ের মনে গভীর দুঃখ-যন্ত্রণা হয়েছিল ও তিনি রাত্রে অনিদ্রায় কাটাতেন। অবশেষে প্রভু খ্রীষ্টের আহ্বান আর বিলম্ব সইল না। তিনি খ্রীষ্টের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হলেন। কালীচরণের মাতা ও ভ্রাতাগণ অনেক কাকুতি মিনতি করলেন; না, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি। শ্রী চন্দ্র সেই পরীক্ষার সময়ে কালীচরণকে সান্ত্বনা দেন ও প্রভু খ্রীষ্টের আহ্বানের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি

Rev. W. C. Fyfe কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। সেই স্মরণীয় দিনের কথাসম্পর্কে Mr. Barber বলেন—'খ্রীষ্টধর্মে' দীক্ষালাভ করলেও কালীচরণ নিয়মিতভাবে পরিবারে টাকা পাঠিয়ে যেতেন। বিবাহ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি হিন্দু আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করে যেতেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী এলোকেশীকে ফিরে পান নাই কিন্তু আইনের সাহায্যে অবশেষে তাঁকে ফিরে পান ও তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার অধ্যাপনার বয়সে তিনি Advocate হন। তিনি হুগলী জেলায় প্রায়ই মোকদ্দমা চালাতে যেতেন। স্বীয় চেষ্টায় অল্প সময়ে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। আইনের ব্যবসায়ে অন্য কাজ করা চলে না। কোনো উপাসনা নির্ধারিত থাকলে অথবা রাজনৈতিক সভা থাকলে তিনি মোকদ্দমা হাতে নিতেন না। দেশেরও সমাজের কাজ তাঁর এত প্রিয় ছিল যে তাঁর ওকালতি ব্যবসাকে ক্ষুণ্ণ করেও তিনি জনপ্রিয় কাজ আগে করতেন।

সর্বপ্রথমে কালীচরণ তাঁর মূল্যবান সময় মিশনের কাজে, অধ্যাপনায় ও কমিটি-মিটিং এর কাজে ব্যবহার করতেন। তার পরে আসত মাদকনিবারণ আন্দোলন ও Y.M.C.A.-র কাজ। সকল সময়ে তাঁকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ে পরামর্শ করতে হ'ত। তাঁর অদ্ভুত বাক্‌শক্তি তাঁকে খুবই জনপ্রিয় করে তোলে। এমন কোন জরুরী সভা-সমিতি ছিল না যা কালীচরণব্যতীত সম্পন্ন হ'ত। ছাত্রদের কাছেও তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় সহনশীলতার সুর ছিল বলে বিভিন্ন স্থান থেকে তার আহ্বান আসত। শ্রীজয়গোবিন্দ সোমের সঙ্গে তিনি *Indian Christian Herald* প্রকাশ করেন। অবশেষে ওকালতি-ব্যবসা ত্যাগ করে তিনি সিটি ও রিপন কলেজে সম্পূর্ণভাবে আইন-অধ্যাপকের কাজ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষক-হিসাবে তিনি যশোলাভ করেন। শেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারও নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হলেও কালীচরণকে আমরা সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে দেখতে পাই। সারা বাঙ্গলা দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠতে লাগলো। তিনি ছিলেন আনন্দমোহন বসু ও রামমোহন বসুর সমসাময়িক। তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের সহিত কালীচরণের মতবাদ এক ছিল।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কালীচরণ কলিকাতা টাউন হলে বিরাট রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দেন যার তুলনা চলে শুধু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহিত। সেই সভার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস'—কেননা ঐ চাকুরীতে ভারতীয় যুবকদিগকে নেওয়া হ'ত না। ঐ সভায় শুধু আই. সি. এস. চাকুরী নয়, অন্যান্য উচ্চপদের চাকুরীতেও ভারতীয়দের নিযুক্ত না করায় প্রতিবাদ করা হয়। এক তেজস্বী বক্তৃতায় তিনি লর্ড মেক্‌লের বিবৃতির প্রতিবাদে বলেন যে বাঙ্গালীরা বরাবরই উন্নতিশীল এবং ইংরাজেরা তাঁদের আমল দেন না। লর্ড মেক্‌লে বাঙ্গালীদের বলতেন যে তাঁরা fulfilling অথবা পরিপূর্ণ করতে পারেন না।

কংগ্রেসে

কালীচরণ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস-আন্দোলনের পুরোভাগে আসেন। আন্দোলনের সূচনা থেকেই তিনি কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন এবং অচিরেই একজন নেতৃস্থানের অধিকারী হন। তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও অপূর্ব বাগ্মিতা ও উন্নত চরিত্রবল কংগ্রেসের Open Session-এর এক সম্পদ-বিশেষ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার Lucknow-এ কংগ্রেস কমিটির পঞ্চদশ অধিবেশনে তিনি শাসনবিধি প্রভৃতি প্রণয়নে নিযুক্ত হন। কালীচরণ এক দৃষ্টান্তে দেখালেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট Prosecutor ও জজের কাজ একত্রে করেন ও নিয়মকে লঙ্ঘন করে চারিজন লোকের ফাঁসীর আদেশ ও তিনজন লোকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যও তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন। পঞ্চদশ অধিবেশনে কালীচরণ আবার তাঁর দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন যে কেন শিক্ষকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করতে পারবেন না। তিনি ভারতীয় এ্যাসোসিয়েশনের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং জীবনের শেষ বয়সে তার সভাপতি হয়েছিলেন। গৃহ-সংসারহীন মাতৃপিতৃহীনদের খ্রীষ্টীয় আশ্রমের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। এইসব তাঁর স্বার্থলেশহীন কাজ চিরদিন অক্ষয়-অমর হয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সভা হয় কালীচরণকে অভিনন্দন জানাতে; কারণ তিনি Legislative Council-এ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সভ্যপদে উন্নীত হয়েছিলেন। সেই সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন

যে কালীচরণ শুধু খ্রীষ্টীয় সমাজের গৌরব নয় কিন্তু সকল সমাজেরই প্রতিনিধিবিশেষ। সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত দেশে সেই সময়ে এই উক্তি বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। তিনি সকল সময়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য চিন্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি ডায়েবেটিস্ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসে দুইটি দল হয়, একটি মধ্যপন্থী, অপরটি উগ্রপন্থী। স্বভাবতঃই কালীচরণের মন এতে বিক্ষিপ্ত হয়। তিনি অধিবেশনকালে মূর্চ্ছিত হন এবং তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই অসুস্থ অবস্থায় তিনি মাদকনিবারণী সভায় যোগদান করেন। তাঁকে সভায় চেয়ারে করে আনা হয় ও নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর পরে কালীচরণের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আর দেখা যায়নি। শবানুগমনে ছিলেন Lt.-Governor, হাইকোর্টের প্রতিনিধিবৃন্দ, কর্পোরেশনের প্রতিনিধি ও শোকাভিভূত সমাজের প্রতিনিধিদল। বাঙ্গলার তদানীন্তন Lt.-Governor এক আবেগময় শোকপূর্ণ বক্তৃতায় কালীচরণের বিবিধ গুণাবলী বর্ণনা করেন। কালীচরণ চিরদিন নিজের নামকে উচ্চীকৃত করার বিরোধী ছিলেন। তিনি সকল সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গেই যেন থাকতেন, এই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। সত্যবাদিতা, গরিমা, সরলতা, একাগ্রতা ও প্রেম এই ছিল তাঁর বিশিষ্ট গুণ। অবশেষে ঈশ্বর তাঁকে ঠিক শান্তির আবাসে ডেকে নেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ তাঁর শোকোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন—কালীচরণের নিঃসঙ্গ সমাজক্ষেত্রে কত বিদ্যা, নিষ্ঠা, দীনতা, সরলতা, ঈশ্বরভক্তির ও দেশভক্তির সমন্বয় হয়েছে। তাঁর সুকোমল হাত আজ ঈশ্বর সরিয়ে নিয়েছেন। সেই চির ভাস্বর স্কুল ও বাটী আজ চিরস্তব্ধ। কিন্তু কালীচরণ আজ সত্যই মারা যাননি তিনি জীবিত আছেন—পরোক্ষে তিনি আমাদেরই মধ্যে জীবিত আছেন; আজ তিনি অমর লোকে। বিডন স্কোয়ারে একটি স্মৃতিফলক তৈয়ারী হয়েছিল, যেখানে তিনি সর্বদা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতেন। স্মৃতিফলকের আশেপাশে বসবার স্থান আছে এবং একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি বসান ছিল (এখন অপসারিত) সেখানে লেখা আছে: এই স্থান কালীচরণের খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ নির্মাণ করেছেন একজনের স্মৃতিতে, যিনি উচ্চ চরিত্রবল

মহৎগুণবিশিষ্ট, বিখ্যাত দেশনেতা ও সমাজনেতা, এবং যাঁর অমূল্য শিক্ষা ও মহান খ্রীষ্টীয় আদর্শ সুরক্ষিত হয়েছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, ইদানীং বিডন স্কোয়ারস্থ কালীচরণের স্মৃতিস্থান অপরিষ্কার ও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে, অগ্রণী হয়ে দেশসেবকের এই পবিত্র স্মৃতিস্থানটি অচিরে পরিষ্কার ও সংস্কার করা আশুকর্তব্য। বাঙ্গলার খ্রীষ্টীয় সমাজও যদি এ বিষয়ে সচেষ্ট ও তৎপর হন ও মাঝে মাঝে ঐ স্থানে খ্রীষ্ট-সুসমাচার প্রচার করেন তবে শুধু ঐ নামের প্রতি নয়, কিন্তু আমাদের মুক্তিদাতার প্রতিও কর্তব্য সাধিত হবে। কবে খ্রীষ্টীয় সমাজে আবার দেখা যাবে যে কালীচরণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে নিদ্রিত যুবসমাজ আবার জাগ্রত হয়ে উঠেছেন? কালীচরণের জন্ম-মৃত্যুদিবস-পালনের প্রচেষ্টাই বা কবে দেখা যাবে?

Calcutta:—Published by the Calcutta Christian Tract and Book Society,
and printed by Norman A. Ellis, Baptist Mission Press,
41A Acharyya Jagadish Bose Road.